দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান লোকনাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসংস্কৃতির বিরাট অঙ্গনে লোকনাটক একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তবে লোকনাটক সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে লোকনাট্য ও লোকনাটক বিষয় দুটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ লোকনাট্য হল 'Folk-theatre' এবং লোকনাটক হল 'Folk-drama'। পক্ষান্তরে বলা যায়, লোকনাটক হল 'Text', আর লোকনাট্য হল তার 'Performance'। লোকনাটকের প্রতিশব্দ রূপে লোকনাট্য কথাটি দীর্ঘদিন ধরে পণ্ডিত ও গবেষকগণ ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু লোকনাট্য ও লোকনাটকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। লোকনাটক মূলত লোকসংস্কৃতির বাক্‌কেন্দ্রিক পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো লোকনাটকেরও কেন্দ্রভূমি হল লোকসমাজ। লোকসমাজের 'লোক' শব্দটি লোকসংস্কৃতির আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। যদিও গ্রাম্য সমাজই লোকসমাজের ভিত্তিভূমি। 'লোক' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'Folk' ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'লোক' শব্দটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "লোক শব্দটির আভিধানিক অর্থ মানুষ বা ব্যক্তি হলেও বর্তমানে বিশেষ অর্থে নাগরিক মানবসম্প্রদায় থেকে ভিন্ন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ঐতিহ্যধারাবাহী গ্রামীণ মানবসম্প্রদায়কেই বোঝায়।"[১]

আবার ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'লোক' শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি হল— "লোক-নাট্যের অন্তর্গত 'লোক' শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। এর অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে লোকনাট্যকেও ঠিক বোঝা যাবে না। একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ যে মানবগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে জাতিগত একটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে, সেই মানবগোষ্ঠীই হল 'লোক'-গোষ্ঠী।"[২]

বরুণ কুমার চক্রবর্তী 'লোক' শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে— " 'লোক' বলতে সাধারণভাবে বোঝায় অপরিচিত Unidentified ব্যক্তি।...কিন্তু 'লোক-সংস্কৃতি'র লোক নিছক তা নয়। একই ভৌগোলিক পরিবেশে কম বেশি একই রূপ জীবন দর্শনের অধিকারী পরম্পরা অনুসরণকারী সংহত সমাজের সদস্যকে বলা হয় লোক।"[৩]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, 'লোক' অর্থ ব্যক্তিমানুষ নয়, গোষ্ঠী তথা লোকসমাজ। 'লোক' বলতে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে সুনির্দিষ্ট একটি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জনসাধারণকে বোঝানো হয়।

আবার 'নাটক'-এর সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "... রঙ্গভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কার্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকে নাটক কহে।"[৪] অর্থাৎ নাটক হল এমন এক ধরনের দৃশ্যবদ্ধ শিল্পপ্রকরণ, যা অভিনয় এবং আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে মানুষের দ্বারা রচিত ও পরিবেশিত হয়।

বাংলায় লোকনাটক ও লোকনাট্য শব্দ দুটি যেহেতু প্রায় অভিন্ন ও সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই পণ্ডিত ও গবেষকেরা লোকনাট্যের সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্নীত হয়নি। লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী তার ভিতরে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়, তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোন ধারা কিংবা ঐতিহ্যও থাকে না।"[৫] আবার তিনি অন্যত্র বলেছেন, "গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।"[৬] এই সংজ্ঞা দুটিতে তিনি জনসাধারণের বা লোকজীবন আশ্রিত কাহিনি এবং মৌখিকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সব লোকনাটকের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ এমন অনেক লোকনাটক আছে যেগুলি পুরাণ, ইতিহাস ও কাল্পনিক বিষয় নির্ভর। যেমন - কুশান, বিষহরা, দোতরা, নটুয়া প্রভৃতি। এছাড়া লোকনাটকের একটি বৈশিষ্ট্য মৌখিকতা হলেও বর্তমানে অনেক লোকনাটক লিখিত রূপ পেয়েছে। এর পেছনে যে কারণটি সক্রিয়, সেটি হল ক্রমবর্ধমান সাক্ষরতা। তাই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পালা লিখিত হলেও তা লোকনাটক বলে বিবেচিত হয়।

নির্মলেন্দু ভৌমিক 'লোকনাট্য'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "কোনো লোকগোষ্ঠীর সংহতি জ্ঞাপক Myth, Ritual, জীবনচর্যার সকল দিক যখন তাদের অভিনয় ও সংলাপে প্রতিফলিত হয়, তখন তা লোকনাট্য হয়।"[৭] এ প্রসঙ্গে বলা যায় Myth-এর ব্যবহার সব লোকনাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আর জীবনচর্যার সকল দিকের প্রতিফলন কেবল লোকনাটকের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'লোকনাট্য'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি হল, "আমাদের দেশে লোকনাট্য বলিতে সাধারণত যাত্রানাটককেই বুঝায় এবং এই অর্থেই শব্দটি আজও প্রচলিত রহিয়াছে।"[৮] কিন্তু এই মতটি একেবারে ভ্রান্ত। কারণ যাত্রা ও লোকনাটকের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও এরা কখনই এক বস্তু নয়। আর এই মতের সমালোচনা করে বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন, "কিন্তু আমরা জানি লোকনাট্য বলতে বিশেষ এক শ্রেণীর নাট্যগুণ সম্পন্ন মৌখিক সৃষ্টিকে বোঝায় যা সংহত সমাজে যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি সংহত সমাজ এর দ্বারা অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করে। যাত্রার সঙ্গে লোকনাট্যের বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।"[৯]

লোকনাটক স্রষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত রচনা, কিন্তু যাত্রা রীতিসম্মত এবং পরিকল্পনাপ্রসুত। নাট্যকার সুপরিকল্পিতভাবে যাত্রা রচনা করেন।

তিনি আর এক জায়গায় 'লোকনাট্য'-এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "আমরা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অনুকরণে বলতে পারি লোকেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত, লোকেদের জন্য অভিনীত, লোকেদের দ্বারা আদৃত মূলত লোক বিষয়ক যে নাটক তাই হল লোকনাট্য।"[১০]

লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ধ্রুব দাস বলেছেন, "লোকনাট্য হ'ল সমাজের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ দর্শন-সঞ্জাত অভিজ্ঞাত দ্বারা সঞ্চালিত নাট্য। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে লোকনাট্য হ'ল লোকধর্মী আচরণের বা সংস্কারের এমন এক নাট্যরূপ যা তার আপন ক্ষেত্রের জনমানসকে আনন্দিত, উল্লসিত এবং অনুপ্রাণিত করে।"[১১]

আবার 'The New Encyclopaedia Britanica' গ্রন্থে 'Folk-Drama' সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Belonging only remotely to Oral Literature is folk drama. Dances, many of them elaborate with masks portraying animal or human characters, and sometimes containing speeches on songs, are to be found in many parts of the preliterate world. Though the action and the dramatic imitation is always the most prominent part of such performances, these may be part of ritual and involve speaking or chanting of sacred texts learned and passed on by world of mouth."[১২]

শিশির মজুমদার বলেছেন, "লোকনাট্য লোকসমাজের অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত এক যৌথ সৃষ্টি যা লিখিত বা অলিখিত এবং মুখে মুখে প্রচারিত হতে পারে।...."[১৩] কিন্তু গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট গ্রামীণ জীবনভিত্তিক মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হলেই তা লোকনাটক হয় না। লোকসাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কথাগুলি প্রযোজ্য হতে দেখা যায়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির আলোচনার নিরিখে আমরা বলতে পারি, যে দৃশ্যকলা লোকভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট বা লিখিত, ঐতিহ্যপরম্পরায় স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক লোকসমাজ, উন্মুক্ত আসরে অভিনীত, বাদ্য-নৃত্য-গীত-সংলাপে পুষ্ট, সামাজিক- পৌরাণিক-কাল্পনিক বিষয়নির্ভর, চরিত্র-সাজসজ্জা-অভিনয় রীতি প্রভৃতির মাধ্যমে লোকজীবন ও লোকমানসকে আনন্দ দান করে তাই লোকনাটক।

এই সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

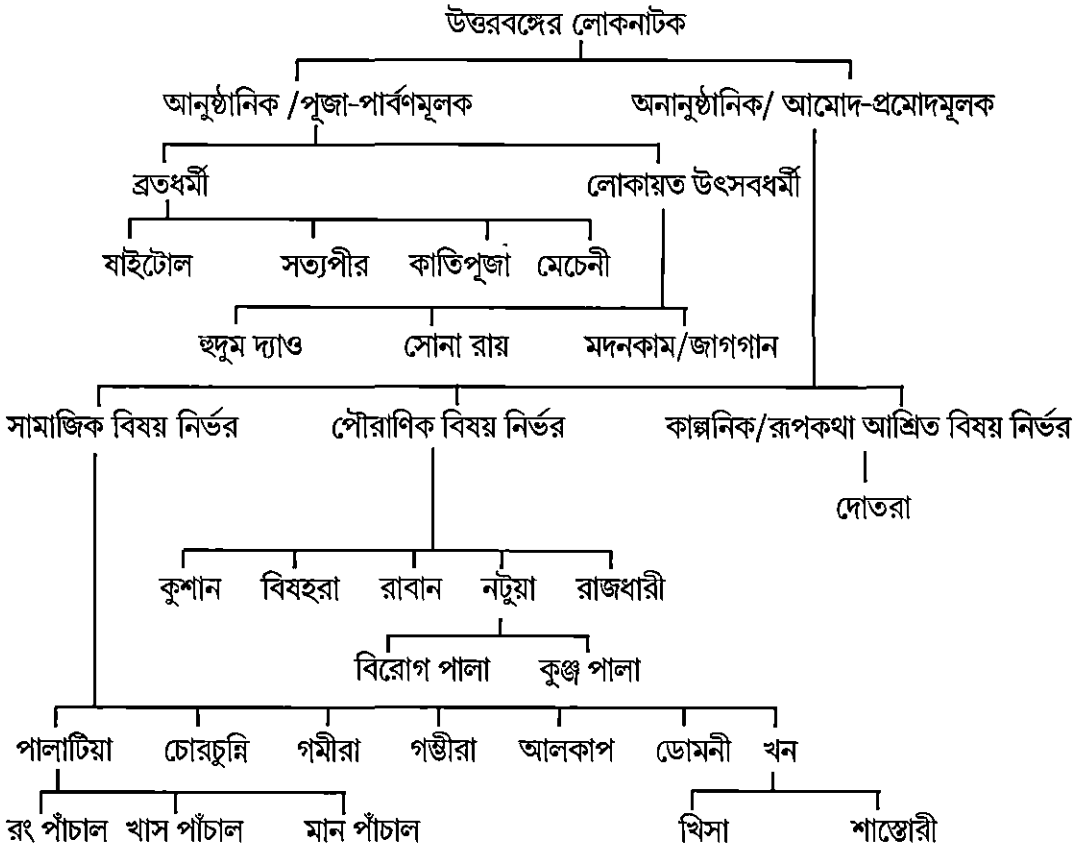

লোকনাটকের প্রকৃতি অনুসারে আমরা একে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি— (i) পূজা-পার্বণমূলক বা আনুষ্ঠানিক, (ii) আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক । "লোকনাট্য সুস্পষ্টভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এই দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। তবে বিস্মৃত হলে চলবে না যে লোকনাট্যের উৎসের বিচারে তার মূলতঃ আনুষ্ঠানিকরূপেই আত্মপ্রকাশ।"[১৪] তাই আনুষ্ঠানিক বা পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটক আমরা সেগুলিকেই বলব যা বিশেষ কোনো ধর্মীয় আচার-আচরণের সাথে যুক্ত । কিন্তু অনানুষ্ঠানিক বা আমোদ-প্রমোদমূলক লোকনাটকে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্য মুখ্য হয়ে ওঠে না । উদ্যোক্তার ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় এ ধরনের লোকনাটক অভিনীত হয় । অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতেও এই দু'টি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

আনুষ্ঠানিক লোকনাটক ঃ

সভ্যতার প্রাক্-মুহূর্তে প্রকৃতির কাছে আদিম মানুষ ছিল শিশুর মতোই অসহায়। হাতিয়ারের মাধ্যমে তারা পশুকে বশে আনতে পারলেও প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি ঘটনার কারণ তাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। তাই এসব ঘটনাকে তারা খুব ভয় পেত এবং এগুলি দেখে বিস্মিত হত। তারা বিশ্বাস করত কোনো অলৌকিক শক্তিই এসব ঘটনা ঘটায়। প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি ভয়, বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে তাদের মনে ধীরে

ধীরে ধর্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। সেই অলৌকিক শক্তিকে তুষ্ট রাখার জন্য শুরু করে নানা ধর্মীয় আচার-আচরণ। যা পরবর্তীকালে 'পূজা' নামে পরিচিতি পেতে শুরু করে। একে একে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দেবতার। "ধর্মের দুইটি মূল দিক আছে - বিশ্বাসের (belief) দিক আর সক্রিয়তার (action) দিক। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার আচরণ এই সক্রিয়তার দিকটিকে প্রকাশ করে। পূজা বলতে আমরা দেবতা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির উদ্দেশে কিছু প্রতীকী ক্রিয়া (symbolic action) বলতে পারি।"[১৫] অর্থাৎ পূজা বলতে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরণকে বোঝায়, যা দেবতা বা অদৃশ্য অথবা অলৌকিক কোন শক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। পূজায় মন্ত্রপাঠ ও বিশেষ ধরনের কিছু ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সেটি পরিবেশিত হয়। এই পূজা ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল কামনায় করা হয়ে থাকে। পূজাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রপাঠ, ব্রতকথা ও বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে সব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করা হয় তার মধ্যেই রয়েছে লোকনাটকের আভাস। তবে এই পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটকগুলি মূলত দেব-দেবী নির্ভর হলেও মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ও এতে স্থান পায়। এ ধরনের লোকনাটকগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — (ক) ব্রতধর্মী লোকনাটক (খ) লোকায়ত উৎসবধর্মী লোকনাটক।

ব্রতধর্মী লোকনাটক ঃ

ঋগ্বেদে 'ব্রত' শব্দটির অর্থ হল 'কর্ম'। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ সংকুচিত হয়ে পরিণত হয়েছে 'প্রার্থনানিষ্ঠ কর্ম'। বুৎপত্তিগত অর্থ বৃ = প্রার্থনা করা + অত = কর্ম। ব্রতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[১৬] অর্থাৎ ব্রত হল এমন কর্ম যার মধ্য দিয়ে ব্রতীর কামনা মূর্ত হয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর মঙ্গল সাধিত হয়। পরিবার ও সমাজের কল্যাণের জন্য প্রাক্‌বৈদিক কাল থেকেই আদিম কোম সমাজে এই ব্রতকর্ম প্রচলিত ছিল। "ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয় পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"[১৭] অর্থাৎ প্রকৃতিকে তুষ্ট রাখার সাধনা থেকেই ব্রতের উৎপত্তি হয়েছিল। আর এই সাধনায় মানুষ নিজের আশা-আকাঙ্খা, কামনা প্রভৃতিকে ব্যক্ত করে। অনুমান করা হয় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যাঁরা ব্রাত্য বা পতিত বলে পরিচিত ছিল, ব্রতধর্ম পালন করতেন বলেই হয়তো তাদের ব্রাত্য বলা হত।[১৮] আবার যে আর্যরা অনার্যদের 'অন্যব্রত' বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল পরবর্তীতে দেখা যায় ব্রত পালন ও ধর্মানুষ্ঠানের দিক থেকে আর্য-অনার্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "নানা ঋতুর মধ্য দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্যকামনায়, সৌভাগ্য-কামনায়- এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে কী আর্য কী অন্যব্রত সব দলেই, এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।"[১৯] মনস্কামনা পূরণের ইচ্ছা থেকেই মানুষ যে আদিম জাদু আচার সৃষ্টি করেছিল, ব্রত হল তারই লৌকিক রূপ। ব্রতের মধ্য দিয়েই ব্রতীর কামনা বাসনাগুলি ফুটে ওঠে। তবে ব্রত কেবল ব্রতীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা দশের মঙ্গলের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।

ব্রত অনুষ্ঠানে পূজার পাশাপাশি ব্রতীরা ব্রতের অঙ্গ হিসেবে ব্রতকথা, ছড়া বা গান করে থাকেন। ব্রতকথার কাহিনিগুলিতে নাটকীয়তাও লক্ষ করা যায়। সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় এই ব্রতকথায়। কোন কোন ব্রতের কথা সংলাপ প্রধান। ব্রতকথা পাঠের সময় ব্রতীমনে কাহিনির দৃশ্যপট ভেসে ওঠে।

ব্রতগুলিতে নাটকের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "ব্রতে এই-সবই রয়েছে - কবিতা চিত্র উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডলশিল্প। এর মধ্যে ছড়াগুলি সব এক-রকম নয়; কোথাও দেখব সেগুলি নাটকের মতো পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্কভেদে সাজানো। ...ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা নাট্যকলা নৃত্যকলা গীতকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্যন্ত পাচ্ছি।"[২০] তাই বিভিন্ন ব্রতে আমরা নাটকের মত পাত্রপাত্রী লক্ষ করে থাকি। কখনও কখনও ব্রতীরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। আবার কিছু কিছু ব্রতে ছড়ার গঠন ও বাঁধুনি রীতিতে নাট্যকলার লক্ষণ রয়েছে। এগুলি কেবল মন্ত্রের মত করে বলা হত না, নাটকের আকারেও অভিনীত হত।

উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত ব্রতগুলি প্রচলিত, সেগুলির বেশিরভাগই নারীসমাজের ব্রত । তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয় । ব্রতগুলি সাধারণত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মঙ্গল কামনায় পালন করা হয় । আর এগুলির মধ্যেও এমন কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণ, মন্ত্র, গান প্রভৃতি লক্ষ করা যায়, যার ভেতর আমরা লোকনাটকের সুত্র খুঁজে পেতে পারি ।এই অঞ্চলে প্রচলিত ব্রতধর্মী পর্যায়ের লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল— যাইটোল, সত্যপীর, কাতিপূজা, মেচেনী প্রভৃতি ।

যাইটোল ঃ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় ষষ্ঠীদেবীর পূজা যাইটোল পূজা নামে পরিচিত। আবার অনেকের মতে শিবকন্যা 'নেতা'ই এই যাইটোল দেবী। তবে এই যাইটোল দেবীই ষষ্ঠীদেবী কিনা এ বিষয়ে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "দেবী যাইটোন এখানে রঙপুর জেলার মতো পুরোপুরি ষষ্ঠী দেবী নহেন কিংবা কোচবিহার জেলার মতো বসুধাকে শস্যশালিনী করিবার জন্য লিঙ্গ-পূজাও নহে।

জলপাইগুড়িতে যাইটোনের পূজা করা হয় সাধারণত বিবাহাদির পূর্বে। রঙপুরের মতো সন্তানাদির মঙ্গল কামনায় জাত্যাশৌচের পরও ইঁহার পূজা করা হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে যাইটোন যথার্থই ষষ্ঠীদেবী এবং কাহিনী লক্ষ করিলে দেবী যাইটোনকে ষষ্ঠীদেবীই বলিতে হয়।"[২১] যাইটোল ব্রতের নির্দিষ্ট কোন দিনক্ষণ নেই। যে কোন শুভ দিনে পূজা করা যায়।

যাইটোল পূজার প্রতিমূর্তি 'যাইটোলের ডোল' শোলা দিয়ে তৈরি করা হয়। যার বাড়িতে এই পূজা হয় তাকে মারেয়া বলা হয়। মারেয়া ছাড়াও এই ব্রতে আরও দুই-তিনজন সহকারী ব্রতী বা বৈরাতি থাকেন। ব্রতকামী গৃহস্থের বাড়িতে গৃহকর্ত্রী একজন অভিজ্ঞা মাঝবয়স্কা মহিলা অর্থাৎ যাকে গীদালি বলা হয়, তাকে নিমন্ত্রণ

3 1 MAR 2016

LIBRARY N.B.U. DARJEELING 278435

করেন ব্রতানুষ্ঠান করার জন্য। গীদালির পরিচালনায় যাইটোল ব্রতের গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গৃহস্থের বাড়ির উন্মুক্ত উঠোনে এই পূজার আয়োজন করা হয়। পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রতকথা সুর ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে গান ও নাচ থাকে। যেমন— পূজা ওচানি (আয়োজন), ফুলবাড়ানি, বন্দনা, মূল গান, ঘট তোলা এবং ঘট ভাসানি। পূজার বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক ক্রিয়াকলাপগুলি নির্দিষ্ট গানের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। গীদালির সঙ্গে চার-পাঁচজন দোহারও থাকেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ গীদালির সঙ্গে 'হুকাতি-ককাতি'র মাধ্যমে কথার খেই ধরে রাখেন। পূজা শেষ হলে যাইটোল ব্রতকথা ও ব্রতগান পরিবেশিত হয়। ব্রতকথার সংলাপগুলি গীদালি ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী মহিলারা নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেশন করে। এই সংলাপ কখনো গদ্যে, আবার কখনো পদ্যে রচনা করে থাকেন দলের সদস্যরা। এছাড়া ব্রতকথার মাঝে লোকনাটকের মত খোসা গান ব্যবহার করতেও দেখা যায়। যেমন—

'নীলা— হায়রে দারুণ বিধি তোর জইন্যে পাঙ্
আনি দে বিষের ভাণ্ড মুই খায়া মরি যাঙ।
ভগবান এত দুঃখ কি নীলার কপালত দিচিস্।
হায় রে দারুণ বিধি।

মণিহার — যেলা মুই কাচারিত বইসোঙ, তোর নীলার কান্দন শোনঙ্
আসিলুঙ মুই কাচারি ছাড়িয়া, তুই কেনে কান্দিস নীলা?
তোর কান্দনে মনটা মোর বাইরাঙ বাইরাঙ করে
নীলা তুই কীসের দুক্কে কান্দিস?

নীলা — সাধুরে মুই কি করিয়া খাইম ভাত।'

সংগ্রহসূত্র ঃ জীতেন বর্মণ (৫৮), ১৬৪ গোপালপুর, জামালদহ, কোচবিহার।

সত্যপীর ঃ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সত্যপীরের কাহিনি বা গানগুলির মধ্যে যে অলৌকিকতা রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলেও সত্যপীর দেবতা সম্পর্কে তেমন কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ-এর মতে, "সত্যপীরের পিতৃমাতৃদত্ত নাম কেহই অবগত নহে, কিন্তু 'সত্যপীর' একটী উপাধি বলিয়াই অনুমিত হয়। ...পুথির লিখিত বিবিধ অলৌকিক বৃত্তান্তের মধ্যে সত্যপীরের প্রকৃত জীবনী অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হয় যে, সত্যপীর হিন্দুবংশজাত ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।"[২২] এক্ষেত্রে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়, "মনে হয়, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কোন অলৌকিকতাসিদ্ধ মুসলমান ফকির বা পীরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাল কিংবা তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তীকাল হইতেই এই পাঁচালিগুলি রচিত হইতে আরাম্ভ করে।"[২৩] এ প্রসঙ্গে

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণ দু-ধরনের ব্রত লক্ষ করা যায়। স্বভাবতই এখানে একটি প্রশ্ন জাগে সত্যনারায়ণ এবং সত্যপীর কি একই দেবতা? তবে শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "...গ্রাম্যদেবতার পুজোগুলি, যেমন মনসা, শীতলা, সত্যপির এগুলিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছু সুবিধা করে নিলেন। মুসলমানের পিরকে লোকে যেমনি পুজো দিতে আরম্ভ [করল] অমনি তাঁকে সত্যনারায়ণ ব'লে প্রচার ক'রে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম দখল বসালেন।"[২৪] তবে সত্যপীরের পূজা, মন্ত্র, ফকিরের পোশাক লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তাতে মুসলমানী ছাপ কিছুটা রয়ে গিয়েছে। এছাড়া সত্যপীরের সিন্নি এবং সত্যনারায়ণের সিন্নির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায় যে, সত্যনারায়ণ আসলে সত্যপীরেরই অপভ্রংশ।

সত্যপীরের মূলত মুসলিম পীর হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পরম শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, সমতল দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে সত্যপীর পূজার প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ করে মুসলিম প্রধান এলাকায় গ্রামাঞ্চলের দিকে এই পূজা ব্যাপক প্রচলিত। পৌষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত চলে এই পূজা। গৃহস্থের মঙ্গল কামনায়, অসুখ-বিসুখ, মামলা মোকদ্দমার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুরাও সত্যপীরের পূজা করেন।

গৃহস্থের সামর্থ্য অনুযায়ী পালাগানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই পালাগান অনুষ্ঠিত হয় বাড়ির উন্মুক্ত উঠোনে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম। পালার মূল গায়ক হলেন একজন ফকির। এই 'ফকির' সম্পর্কে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন, "হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ফকির হইয়া থাকেন।"[২৫] তাঁর হাতে থাকে একটি চামর। এছাড়া দলে থাকেন দোয়ার এবং ছুকরী। পালাগানের আসরে দলের সদস্যরা গোল হয়ে বসে। বন্দনা দিয়ে পালা শুরু হয়। ফকির বন্দনা শেষ করে পাঁচালির কাহিনি সংলাপের মাধ্যমে গেয়ে যান। ছুকরী ও দোয়ার গানের ধুয়া ধরে এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সত্যপীরের পালাগুলির মধ্যে অন্যতম হল— আলঙ্গীর বাদশা, ধর্মী রাজার পালা, আমরুল বাদশার পালা, মালঞ্চার পালা, হীরামুচির পালা, যশমন্ত সাধুর পালা প্রভৃতি। যেমন—

'ফকির — বিদায় দে মা মোক দেরি না সয় আর।
ভর দুনিয়াত যাইম মুই জহুত করিবার।।
খোদাতাল্লা কইছে যদি না যাইস জহুত করিবারে।
শত বংশ ডালি দিবে দোজোগ মাঝারে।।
সইন্ধা — না দিম না দিম বাছারে না দিম ছাড়িয়া।
হিয়ার মাঝরে তোকে রাখিম রে বান্দিয়া।।
ফকির — ভাল করিয়া কইতে যদি না দিবু ছাড়িয়া।
আন্ধার রাইতোত ছাড়ি যাইম তোক না যাইম কয়া।।' (আলঙ্গীর বাদশা)

সংগ্রহসূত্র ঃ জীতেন বর্মণ (৫৭), ১৬৪ গোপালপুর, জামালদহ, কোচবিহার।

কাতিপূজা ঃ কাতিপূজা হয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে। তবে মানত করা থাকলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এই কাতিপূজা হতে পারে। সন্তান কামনা করে এই ব্রত পালন করা হয়। উত্তরবঙ্গে কামরূপ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই পূজার প্রচলন লক্ষ করা যায়। মূলত মহিলারাই এই ব্রত পালন করেন। ব্রতীরা নিজেরাই ব্রতের আয়োজন করে। একজন অভিজ্ঞা গীদালি পৌরহিত্য করেন। পূজার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলি, যেমন— পূজার ঘট বসানো, চাইলোন সাজানো, পুরোহিত, ঢাক প্রভৃতি বরণ করেন গীদালি। এছাড়া গীদালিকে পূজার কাজে সাহায্য করেন কয়েকজন বৈরাতি। পূজার জন্য নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক গানগুলি করে থাকেন এক বা একাধিক বৈরাতি।

পূজানুষ্ঠান শেষ হলে সারারাত ধরে চলে বিভিন্ন রঙ্গরসে পরিপূর্ণ ব্রতকথা, নৃত্য ও সঙ্গীত। এই গানগুলিতে আদি-রসাত্মক কথা প্রচুর পরিমাণে থাকে। কার্তিকের বিবাহ এবং তার সঙ্গে মা-ঝিয়েদের রঙ্গ তামাসা এসব নিয়েই গানগুলি রচিত হয়। মাতা বসুধার বন্দনা দিয়ে শুরু হয় গান। বন্দনা শেষে মূল গানে প্রবেশ করেন গীদালি। যেমন—

'শিব — শোনেক কাত্তি কয়া বুজাঙ তোক
সাতালী না পর্বততলে আছে রে বালাবতীর কইনা
উনায় আছে রে হরির কমণ্ডুলে
সাতালী না ফাটেয়া বালাবতীক বিয়াও করা তুই
গীদালি (গান) — ও কি ও রে হায় হায়
কান্দে কাতি মোর শিবের চরণ ধরি রে।
কার্ত্তিক — সইত্য করি কইচোঙ রে বাপো বিয়াও না করিম
শিব — শোনো শোনো কাত্তিরে কুমার
তোর এই কাথা যদি চণ্ডী শুনিবারে পায়
দেব নারী ধরি রে কাত্তি বিয়াও দিবে তোর।'

সংগ্রহসূত্র ঃ সরস্বতী রায় (৫৮), বরুয়াপাড়া, ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

বৈরাতিগণ সেই গানের ধুয়া ধরেন এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। গান ও নাচ চলাকালীন আড়ালে গিয়ে ঢাকি ঢাক বাজায়। আবার অঞ্চল বিশেষে কোথাও কোথাও দেখা যায় গানের পরের ভাগে একজন বৈরাতি হাঁটু গেড়ে বসে গরুর ভূমিকায় অভিনয় করে। এমন সময় একজন বাঘ সেজে বেরিয়ে এসে হালের গরুকে ধরে নিয়ে যায়। কৃষকরূপী নারী বাঘের কবল থেকে গরুকে রক্ষা করার জন্য চিৎকার করতে থাকে। এরপর পুরুষ

বেশধারী গীদালি লাঠি নিয়ে বাঘ তাড়াবার চেষ্টা করে। এভাবে ধান লাগানো, বিয়ে, ধান কাটা প্রভৃতি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়।

তিস্তাবুড়ি পূজা বা মেচেনী ঃ তিস্তা উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নদী। আর এই তিস্তাকে কেন্দ্র করে যে পূজা প্রচলিত, তাকে তিস্তাবুড়ি পূজা বলা হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে রাজবংশী রমণীরা ঝড়ঝঞ্ঝার হাত থেকে রক্ষা পেতে এই ব্রত পালন করেন। এই পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান অঞ্চলভেদে মেচেনী বা ভেদেইখেলি নামে পরিচিত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর মতে, "উত্তরবাংলার সবচাইতে দুরন্ত নদী তিস্তা; নৃত্য ও বাদ্যভান্ড সহকারে তিনি গ্রীষ্মকালে স্ত্রী সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত হন। ....মেচ সম্প্রদায়ের আধা হিমালয়বাসী এক জাতি একদিন ঐন্দ্রজালিক ও আচার নৃত্যে এবং সঙ্গীতে তার পূজো করত। সেই জন্য এখন পর্যন্ত এই নৃত্যের নাম মেচেনি নাচ অর্থাৎ মেচ মেয়েদের নাচ।"[২৬] এই একই ধরনের মতামত জ্ঞাপন করেছেন ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, তিনি বলেছেন, "মেছেনী' নামের মধ্যে আসাম ও জলপাইগুড়ির সীমান্তস্থিত মেচ উপজাতির নামের ছোঁয়া আছে বলিয়া মনে হয়। ...যে কোনো নদী বা জলাশয়কেই পূজা করিবার প্রথা মেচদের মধ্যে খুবই দেখা যায়।"[২৭] আবার ড. চারুচন্দ্র সান্যাল এই 'মেচেনী' সম্পর্কে বলেছেন, "It is said that the worship had its origin from the mechs who inhabited this part of the country before the Rajbansis settled in this area."[২৮] তবে এ সকল মত খণ্ডন করে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় মনে করেন, "বেশ কয়েক পুরুষ পূর্বে মেচী নদী তীরবর্তী অধিবাসীরা এই নদীকে পূজা দিবার প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন এবং পূজার সহিত একটি গীতিউৎসব যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে গীতিশাখাটির নাম হইয়া যায় মেচেনী খেলা এবং পরে তাহা তিস্তাবুড়ি পূজার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই কারণেই সম্ভবতঃ মেচীনদীর পূজাটি তিস্তানদীর পূজায় রূপান্তরিত হইলেও গীতিশাখাটির নাম মেচেনী খেলাই থাকিয়া গিয়াছে।"[২৯] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বহুকাল পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলায় দোমহনী অঞ্চলে তিস্তা নদীর একটি শাখা নদী ছিল মেচী নদী।

মেচেনী উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের একটি নারীকেন্দ্রিক ব্রতানুষ্ঠান। বৈশাখ মাসে এই পূজা হয়ে থাকে। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস এই যে, তিস্তাবুড়ির পূজা করলে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই পূজার নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগে থেকেই মেচেনীর দল বাড়ি বাড়ি নাচ ও গান করে বেড়ায়। ১০-১৫ জন মহিলা নিয়ে এক-একটি মেচেনীর দল গঠিত হয়। দলের মধ্যে থেকে একজন অভিজ্ঞা রমনী দলনেত্রী নির্বাচিত হন, তাকে বলা হয় মাড়েয়ানী। একটি বাঁশের ডালার মধ্যে একদলা এঁটেল মাটি হল দেবী তিস্তার প্রতীক। সেখানে কিছু ফুল, আতপচাল, কাঁচা দুধ, সিঁদুর প্রভৃতি দেওয়া থাকে। এরপর একটুকরো সাদা কাপড় দিয়ে সেটিকে ঢেকে নেওয়া হয়। মাড়েয়ানী একটি ছাতা মাথায় ধরে ডান কাঁধে ডালা নিয়ে যান। সেই ছাতাটিকেও খড়িমাটি দিয়ে আলপনা এঁকে সিঁদুরের ফোটা এবং শোলার ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

এই ব্রতে কতগুলি আনুষ্ঠানিক পর্যায় রয়েছে। ব্রতের প্রথম দিন অর্থাৎ 'ফটা মারার দিন' মাড়েয়ানীর নিজের বাড়ির উঠোনে পিঁড়ি পেতে ডালাসহ ছাতাটি তার মধ্যে রাখা হয়। তিস্তাবুড়িকে স্বর্গ থেকে মর্তে আনার জন্য ধূপ-দীপের সাহায্যে বন্দনা গান করেন মাড়েয়ানী। দলের অন্যান্য সদস্যরা সেসময় তার গানের ধুয়া ধরেন এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গানের সময় কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। কেবল হাতে তালি দিয়ে তাল ধরা হয়। সেজন্য এই গানের তালকে 'থাপুরি' বলা হয়। এরপর দেবীকে মর্তে নেমে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, সেই গানকে বলে 'নামানী'। 'বসানী' গানের মাধ্যমে দেবীকে আসন দেওয়া হয়। একে একে তিস্তাদেবীকে জাগানোর 'জাগানী' গান এবং গ্রামদেবতাকে স্মরণ করে অন্য বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন পথ দিয়ে চলার সময় যে গানগুলি পরিবেশিত হয়, যা পাথারিয়া গান নামে পরিচিত সেগুলি গাওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে চলার পথে যেসব খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিত্র তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই উপাদান নিয়েই তারা গান বাঁধে। যেমন—

'হি বাড়ির গিরথানীটা
বড়য় খেচেরী গে।
বাহির হয়া জোগাড় দেও
আঙ্গিনাৎ মেচেনি গে।।'

অথবা

'নয়া নয়া কুলাখান
বেতের বনে গে বেতের বান।
কোটকী দিলে ধান গে
কোটকী দিলে ধান।
এই গুটিক ধান দিয়া
নাচালো গে শিকোই ঢুলী
ভাতার শুনিলে ডাঙাবে তোক।'

সংগ্রহসূত্র ঃ সন্ধ্যা রায় (৪০), সদাগর পাড়া, কাদোবাড়ি, জলপাইগুড়ি।

মেচেনীর দলকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলেই গৃহস্থেরা বাড়ির উঠোনে অবস্থিত দেবস্থানে অর্থাৎ তুলসীমঞ্চের সামনে পরিষ্কার জল ঢেলে সেখানে একটি পিঁড়ি পেতে দেন। গৃহস্থেরা দেওয়া তেল সিঁদুর দিয়ে দেবীকে বরণ করা হয়, তাকে বলে 'চুমানী'। দলটি পিঁড়ির ওপর ছাতা রেখে 'নাচানী' পর্বের গান গায় এবং সেই জল ঢালা জায়গাটিতে দলের কিশোরীরা নাচতে থাকে। সেই নাচের জায়গাটিতে বালতি দিয়ে সামান্য জল ঢালা হয়, যাতে জায়গাটি পিছল হয়। নাচনীরা দু'পা জোড়া করে মাটিতে ঘষতে ঘষতে বিশেষ একপ্রকার ভঙ্গীতে বৃত্তাকারে

ঘুরে নাচে। এই গানগুলিতে দেবতার স্তুতি ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা এবং নিকটবর্তী গ্রামের নানা ঘটনা গানে উঠে আসে। তাই দেখা যায় পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানের বিষয়বস্তু প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়। 'নাচানী' পর্বের শেষে গৃহকর্ত্রীর কাছে মাঙ্গন আদায় করে মেচেনীর দল ডালায় রাখা পুটলি থেকে আতপ চাল ও ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করেন। পিঁড়ি থেকে ছাতা ওঠানোর সময় 'উঠানী' গান গাওয়া হয়। সারাদিন গ্রাম পরিক্রমার পর সন্ধ্যার সময় দলটি মাড়েয়ানীর বাড়িতে ফিরে এসে তুলসীমঞ্চে ছাতা রেখে 'ঘরবৈঠানী' গান গেয়ে ঐ দিনের অনুষ্ঠান শেষ করে। সারা বৈশাখ মাস বাড়ি বাড়ি নাচ-গান করে মাঙ্গন আদায় করার পর অন্তত একদিন কোন হাটে যেতে হয়। একে 'হাটঘুরানী' পর্ব বলা হয়। মাসের শেষে কোন জলাশয়ে বা নদীতে কলার ভেলায় দেবীকে স্থাপন করে পূজা দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে মেচেনীর দল ডাঙায় বা নদীর চরে যে নৃত্যগীত পরিবেশন করে, তাকে 'ভুরাভাসানী' গান বলে। সেই দিন বা পরের দিন মাড়েয়ানী নিজের বাড়িতে 'দেহর'-এর আয়োজন করে। বাড়ির উঠোনে দেবস্থানে শিব ও তিস্তাবুড়িকে পূজা দেওয়া হয়। এই পূজা চলাকালীন মেচেনী দলের সদস্যরা নামানী, জাগানী এবং নাচানী পর্বের গান পরিবেশন করে। অবশেষে বিভিন্ন বাড়ি থেকে সংগৃহীত চাল রান্না করে খাওয়ার মাধ্যমে মেচেনী ব্রতের সমাপ্তি হয়।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক মেচেনী ব্রতে লোকনাট্যের আভাস খুঁজে পেয়ে বলেছেন, ''লোকনাট্যের একটি বড় দিক হল, এতে বিনা প্রস্তুতিতে কোন বিশেষ বিষয়-প্রসঙ্গ, চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হয়। Improptue রীতির বিশেষ প্রয়োগ এখানে দেখা যায়। যদি অনুষ্ঠানটিকে 'খেলা' বলে মনে করা হয় এবং চলতে চলতে , যেতে-যেতে, সেই দৃশ্য-ঘটনা-চিত্রকে বিনা প্রস্তুতিতে গানে ভেতরে নিয়ে নেবার সুযোগ বা প্রথা বা অবকাশ থাকে, তবে সহজেই তা লোকনাট্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। ... মেছেনী গানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায় হ'ল 'নাচানিয়া' ও 'পাথারিয়া' পর্যায়। 'নাচানিয়া' পর্যায় অনুষ্ঠিত হয় গৃহের অঙ্গনে; নামের থেকেই বোঝা যায়, তা নৃত্য সম্বলিত গান। আর, 'পাথারিয়া' গান গাওয়া হয় পথে চলতে-চলতে। গুরুত্বের দিক বিবেচনা করলে, আমার মতে, 'নাচানিয়া' পর্যায়ের তুলনায় 'পাথারিয়া' পর্যায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। নাচানিয়া যেহেতু গৃহাঙ্গ নের গান, সেহেতু তা ফর্মের দিক থেকে নৃত্য জড়িত বলে কিছু বাঁধাবাঁধির অন্তর্ভুক্ত, সেই কারণেই উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনার সুযোগ 'পাথারিয়া'র তুলনায় কম। অপর দিকে, 'পাথারিয়া' পথচলতি দৃশ্য-ঘটনা-চিত্রের বিবরণ ও রূপায়ণ বলে তাতে প্রসঙ্গগুলির তাৎক্ষণিক অন্তর্ভুক্তি সহজেই ঘটে, যা লোকনাট্যেরই একটি বিশেষ দিক। পথে দুই মেছেনী দলের সাক্ষাৎ হয়ে গেলে দুই দলে তৎক্ষণাৎ গানে-গানে লড়াই ও বিতর্ক বেঁধে যায়। নাটক তখন পুরোমাত্রায় এসে পড়ে।''[৩০] মেচেনীর বিভিন্ন পর্বে গানের মাধ্যমে মেচেনী দলের উক্তি-প্রত্যুক্তি, মাড়েয়ানীর মধ্য দিয়ে তিস্তাবুড়ির বক্তব্য পরিবেশন এবং নাচানী পর্বে গৃহকর্ত্রীর অভিব্যক্তি প্রকাশ প্রভৃতি লোকনাটকের বৈশিষ্ট্যকেই মনে করিয়ে দেয় । এই মেচেনী খেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও সমতল দার্জিলিং জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে প্রচলিত।

লোকায়ত উৎসবধর্মী লোকনাটক ঃ

ধর্মীয় আচার-আচরণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উৎসব। বলা যায় এই উৎসবের মধ্য দিয়েই মানুষের যৌথ অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, "...একদল মানুষ যখন যৌথভাবে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ উপলক্ষে নির্দিষ্ট তিথিতে পৌনঃপুনিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে পালন করে তখন সেই অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়।"[৩১] অর্থাৎ কোন জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনাই উৎসবকে সার্থকতা দান করে। যে সব উৎসব লোকসমাজে প্রচলিত, সাধারণ মানুষ যেখানে আনন্দে মূর্ত হয় তাকে লোকউৎসব বা লোকায়ত উৎসব বলা যেতে পারে। আর লোকসমাজ বলতে আমরা মূলত গ্রামীণ জনসাধারণকে বুঝি। এই উৎসবের আদি রূপ হল পার্বণ।

উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোকউৎসবগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে এসেছে। তাই লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. দুলাল চৌধুরীর মতে, "পরবর্তীকালে এই উৎসবগুলিতে আর্যসংস্কৃতি ও সভ্যতা কিছুটা পেলবতা দান করলেও এগুলির মধ্যে মূল আদিম ভাবটি এখনও থেকে গেছে।"[৩২] তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই আদিম ভাবটি থেকে যাওয়ার ফলে লোকউৎসবগুলি অনেকটা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। এই লোকউৎসবগুলির আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিতেও লোকনাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। এই অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোকউৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম হল— হুদুম দ্যাও, সোনা রায়, জাগগান প্রভৃতি।

হুদুম দ্যাও ঃ 'Fertility' অর্থাৎ 'উর্বরতা' জীবজগতের একটি অতি আবশ্যিক বিষয়। এর অভাবে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এবং তখন থেকেই জীবজগতে প্রজননের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরণ। এ প্রসঙ্গে ড. রেবতীমোহন সরকার মনে করেন, "বনে পশুপাখির বৃদ্ধি, ক্ষেতে ফসল বৃদ্ধি এবং ঘরে ঘরে মানব সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মানুষের প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল উর্বরতা সংক্রান্ত নানা ধরনের জাদু-ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন যা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল।"[৩৩] আর সেই অনুষ্ঠানগুলি আজও অবিচ্ছিন্ন গতিতে আমাদের সমাজে টিকে রয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষিকে কেন্দ্র করে যে সকল দেবতা উদ্ভব হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই প্রজনন শক্তি ও উর্বরতার প্রতীক। এখানে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে ভূমিকে। নারীরূপী ভূমিকে উর্বরতা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাদুধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করা হয়, যা 'Fertility cult' অর্থাৎ 'উর্বরতা আচার' নামে পরিচিত।

জল প্রকৃতির এক অন্যতম উপাদান, যা ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। আবার জল ছাড়া পৃথিবীতে কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না, তাই জলের অপর নাম জীবন। আমাদের ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আর এই কৃষিকাজ বৃষ্টিপাতের উপরেই নির্ভরশীল। তবে অতিবৃষ্টি যেমন ফসলের ক্ষতি করে, তেমনি অনাবৃষ্টির

ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। অনাবৃষ্টি বা খরার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানাধরনের যাদুধর্মীয় আচার-আচরণ পালিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার তাঁর 'The Golden Bough' গ্রন্থে এ ধরনের অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি প্রাচীনকাল থেকেই ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি আদি-বৈদিক দেবতাকে পূজা করার নিয়ম চলে আসছে। রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লেখিত রাজা জনকের হালকর্ষণ, সীতার জন্ম এবং খাণ্ডব দহনে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ অর্থাৎ সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় যে জলদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল তা অনুমান করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশে মেঘরানীর ব্রত, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রব্রত ও বসুধরা ব্রতের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বৃষ্টির দেবতা হলেন হুদুম দ্যাও। 'হুদুম' শব্দটির উৎস সম্পর্কে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "হুদুম শব্দটি উলঙ্গ অর্থে 'উদুম' হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ...এই গান গাহিবার সময় মেয়েরা একেবারে উলঙ্গ হইয়া থাকে। উলঙ্গ হইয়া যে গান গাওয়া হইয়া থাকে, তাহাই হুদুমার গান এবং সেই দেবতার নাম 'হুদুমা' বা 'হুদ্‌মা' বা 'হুদুম-চুকা'।"[৩৪] অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রাম্যসমাজে বৃষ্টির প্রার্থনায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এটি নারীকেন্দ্রিক লোকাচার, তাই পুরুষের প্রবেশাধিকার ও দর্শন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল মনে করেন, "No men are allowed to go near the dancing place. If somebody ventures noone will abuse the women if they attack the man with the 'daos' they possess or even kill him."[৩৫] লোকালয় থেকে দূরে চাষের জমিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কথিত আছে, পুরুষেরা এই অনুষ্ঠান দর্শন করলে পূজানুষ্ঠান ব্যর্থ হতে বাধ্য। রাজবংশী সমাজে এই হুদুম দ্যাও সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বৃষ্টির দেবতা হুদুম দ্যাও কোন কারণে রুষ্ট হলে তিনি বৃষ্টি বা জল দেন না। নারীদেহের মাধ্যমে এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই বৃষ্টি হবে, কৃষিকাজ হবে, ফসল রক্ষা পাবে। তাই কোন এক অমাবস্যার রাতে সধবা মহিলারা এলো চুলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে পূজা শুরু করে। এই হুদুম দ্যাও সম্পর্কে W.W. Hunter লিখেছেন, "A singular relic of old superstition is the worship of the God called Hudm-deo. The women of a village assemble together in some distant and solitary place, no male being allowed to be present at the rite, which is always performed at night; a plantain or a young bamboo is stuck in the ground, and the women, throwing off their garments, dance round the mystic tree, singing old songs and charms. This rite is more especially performed when there is no rain, and the crops are suffering from drought."[৩৬] স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "To put an end to drought and bring down rain, women and girls of the village of ploska are wont to go naked by night to the boundaries of the village and there pour water on the ground."[৩৭] অর্থাৎ 'হুদুম দ্যাও' অনুষ্ঠানটির মতো 'polska'-র একটি গ্রামে মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় একই ধরনের আচার পালন করে। সারা পৃথিবী জুড়ে এরূপ 'Fertilety Cult' ধর্মী লোকাচার প্রচলিত আছে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার সমতল অংশ ও দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই পূজা প্রচলিত। হুদুম দ্যাও পূজায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন একজন নারী পূজা দেন এবং মন্ত্রপাঠ করেন। তাদের মধ্যে আর একজন যিনি একমাত্র সন্তানের জননী তিনি এক নিশ্বাসে একটি ছোট কলাগাছ তুলে আনবেন। অন্যান্য মহিলারা সেই কলাগাছটিকে কিছুটা দূরে পুঁতে দেয়। এরপর সেই কলাগাছটিকে ঘিরে শুরু হয় নাচ ও গান। যেমন—

'কানায় শুনে হুদুমে দ্যাখে
ওরে হুদুম ধোকড়া ধরি আয়।
খেকরি দিয়া খ্যাওড়ে তুলেক মাছ
দেওয়ারও ম্যাঘ ম্যাঘালি
ঝড়ি গেইছে আইজ।'

অথবা

বাড়া ভুখাঙ বাড়া ভুখাঙ রে
ভাতো বেলায় আন্দোং।
সেই ভাতো খাবে এলা মোর
হ্যানা হুদুম দ্যাও।
সেই ভাতো খাবে হুদুম দ্যাও
মইধ্য আইনাত বসি রে মইধ্য আইনাত বসি।'

সংগ্রহসূত্র ঃ কল্পনা দাস (৬৫), বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

নৃত্য গীতের মাধ্যমে ব্রতীদের এ ধরনের অভিনয় লোকনাটকের ফর্মকেই মনে করিয়ে দেয়। কোথাও কোথাও কাঁদামাটি ও গোবর দিয়ে তারা হুদুমের মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, "তিস্তার তীরবর্তী পাহাড়পুর ও বালাপাড়া অঞ্চলের হুদুমার অনুষ্ঠান বেশ মনোরম। এই সকল স্থানে হুদুমার বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে।"[৩৮] আবার ড. চারুচন্দ্র সান্যালের মতে অঞ্চলবিশেষে দেখা যায়, "Two women kneel on the ground like cows and draw a plough to scratch a few feet of the land. Into the furrow thus formed they spread some paddy seeds or plant a few paddy seedlings."[৩৯] পূজা শেষ হলে তারা দলবদ্ধ হয়ে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায়। এক বাড়ি থেকে অন্যবাড়ি যাওয়ার সময় তারা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আড়ালে যান। সে সময় তারা যৌনসংগমকালীন ভাবগুলি নিজেদের দেহে ফুটিয়ে তোলে। যে বাড়িতে দলটি প্রবেশ করে, সেখানকার পুরুষেরা অন্যত্র চলে যান। বাড়ির উঠোনে দলটি যে নৃত্য সহকারে গান করেন তার মধ্যে যৌন আবেদন ও শৃঙ্গার রসাত্মক ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সোনা রায়ঃ উত্তরবঙ্গ একসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ফলে বাঘ-ভালুকসহ অন্যান্য বন্যজন্তুর আক্রমণের ভয়ে এখানকার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। এদের মধ্যে বাঘের ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই ব্যাঘ্রভীতি দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে সোনা রায় দেবতার উদ্ভব হয়। আর তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য সোনা রায়ের পালাগানের প্রচলন। ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায় সম্পর্কে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ লিখেছেন, "মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা তৎপূর্ব্বে, কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় এবং রূপারায় নামক দুইজন ধর্ম্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহাদের প্রকৃত বিবরণ বিবিধ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।"[৪০] কিন্তু সোনারায় ও রূপারায় ধর্মসংস্কারক হয়ে কিভাবে ব্যাঘ্রদেবতায় পরিণত হলেন, তা স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। তবে যাই হোক এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "...সোনারায় ও রূপারায় হয়তো ধর্মসংস্কারকই ছিলেন। ধর্ম ঠাকুরের আশীর্বাদে, শ্রীকৃষ্ণ শ্বেত মাছির রূপ লইয়া গোয়ালিনী নন্দরানীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারাই সোনারায় এবং রূপারায় এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে ইঁহারাই জনগণকে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ জনগণের মনে মুসলমান প্রতাপ এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, মানুষের চেয়ে অধিক প্রতাপশালী ব্যাঘ্রের আশ্রয় লইয়া, কল্পনায় সেই দুর্দান্ত মোগল সৈন্যদের পরাভূত করা হইয়াছে। বস্তুত সোনারায় ঠাকুরের গান দেশের ধর্ম-ইতিহাসের এক বিশেষ দিককে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, এই লৌকিক গানের সাহিত্যিক মূল্য না থাক, ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"[৪১] এই পূজা সাধারণত কৃষক, রাখাল ও গো-পালকদের মধ্যে বেশি প্রচলিত। অঞ্চলভেদে শিব চতুর্দশী অথবা পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা হয়ে থাকে। পূজার প্রায় ৭-৮ দিন আগে ভক্তরা দলবেঁধে মাঙ্গন সংগ্রহের জন্য বাড়ি বাড়ি মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গান গেয়ে বেড়ায়। দলের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সোনারায়ের পালাগান সুর করে গেয়ে যান। অন্যেরা সেই গানের ধুয়া ধরেন। দলের প্রত্যেকের হাতে মাঝারি আকারের একটি বাঁশের লাঠি থাকে। সেই লাঠিকে কাপড়, ফুল ও রঙ দিয়ে সাজানো হয়। এছাড়া একজনের হাতে থাকে চামর এবং অন্য জনের কাছে একঘটি দুধ মেশানো জল ও ফুল। কোন কোন দলে খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থাকে। আবার কোন দলে দেখা যায় বাদ্যযন্ত্র ছাড়া খালি হাতে গান গেয়ে মাঙ্গন সংগ্রহ করা হয়। সোনারায়ের পালাগানের প্রথম ধারায় সোনারায় ও রূপারায়ের জন্মকাহিনি এবং মুসলিম মোগল সৈন্যদের পরাজিত করে নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার, এবং দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে পূজার জন্য মাঙ্গন সংগ্রহ করা। যেমন—

সত্য ঠাকুর সোনা রায় মাগিয়া বেড়াং তোক।
তিন দিন হাতে চায়া বেড়াং নাগাল না পাং তোক।।
সত্য ঠাকুর সোনা রায় গিরস্তক দেও রে বর।
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাংকর।।
গোয়ালিতে বাড়ুক গরু ধান বাড়িতে ধান।

দেওয়ানে দরবারে গিরি পাউক ফুল পান।।

পদ — সোনা রায় সন্নাসী হৈল রূপা রায় চেলা।

ধীরে ধীরে দুই ভাই পন্যে দিল সেলা।।

গৌরবন ছাড়ি ঠাকুর নামিল ঘোড়াঘাট।

ঠাকুরের সঙ্গে চলে বিশশত বাঘ।।

বিশশত বাঘ ঠাকুর অরণে রাখিয়া।

ঘরে ঘরে ফেরে ঠাকুর হরির নাম দিয়া।।'

সংগ্রহসূত্র ঃ স্বর্গীয় দিলীপ দাস, উত্তর ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

গানগুলিতে রাজবংশী সমাজের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে। সোনারায়ের পূজা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, সমতল দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। গাথাধর্মী এই গানের মধ্যেও নিহিত আছে লোকনাট্যের ভাববীজ।

মদনকাম বা জাগগান ঃ উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম লোকউৎসব হল মদনকাম বা বাঁশপূজা। এই পূজা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথি উপলক্ষে চারদিন ধরে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মদনকাম পূজা সম্পর্কে ড. চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন, "The first day of this puja (khela) is called Bas Jagao (Bas Dzagao) day. Some boys dress as girls and some boys take fancy dress of various descriptions. The bamboo poles are carried by some members of the party and the persons in fancy dress sing and dance with music of drum and bell-metal gong. When they arrive at the house of a villager they keep aside the bamboos on a piece of cloth and then begin their song and dance. It is called Birsani Khela".[৪২] মদনকাম উৎসবটি মূলত উর্বরতাকেন্দ্রিক আচারের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য বাঁশকে কামদেবতার প্রতীকরূপে গণ্য করে পূজা করা হয়। বাঁশের মাথায় চামর বেঁধে লাল শালু কাপড় বাঁশগুলোতে জড়িয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। এরপর সেগুলিকে বাড়ির বাইরের কিংবা ভেতরের উঠোনে মাটিতে গেঁড়ে পূজা দেওয়া হয়ে থাকে। পূজা শেষে কোন জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁশগুলোকে জল খাওয়ানো হয়। পরে সেই বাঁশগুলোকে হাতে নিয়ে চলে নৃত্যগীত। এই মদনকাম উৎসবের দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, যথা— মাঙ্গনের গান ও পালা গান বা জাগ গান।

মদনকাম ঠাকুরের বাঁশ ও কাম-লিঙ্গ নিয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ছোট থেকে বড় বিভিন্ন দল গান ও নাচ দেখিয়ে মাঙ্গন আদায় করে। বাঁশপূজার উদ্দেশ্য যেহেতু নর-নারীর কাম-উর্বরতা বৃদ্ধি, তাই এখানে নারী-পুরুষের কাম-উদ্দীপনার গান গাওয়া হয়। তবে একথা স্বীকার্য, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি মাঙ্গনের সময় দলগুলি

শালীনতার সীমা লঙঘন করে না। দলের সদস্যরা মুখে ভুষাকালি মেখে নাচগানের মাধ্যমে মানুষের মনোরঞ্জন করে। গানের ভাব, দলের লোকসংখ্যা, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও সাজসজ্জা অনুসারে দলগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– পেষ্টা বান্ধা দল, ক্যাঙবাজানী দল, ঢুলুয়া ও খ্যামটালী দল। দলগুলির পরিবেশিত গানে আদি-রসাত্মক ভাব ও যৌন আবেদন পূর্ণমাত্রায় থাকে। পেষ্টাবান্ধা দল দু'একজন বৃদ্ধ বা মাঝবয়সী লোককে নিয়ে গঠিত হয়। এদের মধ্যে একজন টিন বা ক্যানেস্ত্রা বাজিয়ে গান করে, অপরজন সেই গানের সাথে নেচে থাকে । এই দলের লোকের হাতে ও পায়ে পেষ্টা বাঁধা থাকে, তাই এদের পেষ্টাবান্ধা দল বলে। উল্লেখ্য খড় ও দড়ি দিয়ে বেনীর মতো পাকানো গোলাকার বন্ধনীকে আঞ্চলিক স্থানীয় ভাষায় পেষ্টা বলা হয়। এই দল যৌবনের রসে ভরা গান গেয়ে থাকে। ক্যাঙবাজানী দলে আট-চোদ্দ বছর বয়সী ১২-১৫ জন ছেলে লক্ষ করা যায়। এই দলে দু'জন ক্যানেস্ত্রা বাজায় এবং বাকী সকলেই গান ও নাচ করে বেড়ায়। আবার ঢুলুয়া ও খ্যামটালী দলে ১৫-২০ জন সদস্য থাকে। এদের মধ্যে একজন গীদাল, যার হাতে থাকে চামর, একজন দোহার বা মতিহারি এবং দু'জন থাকে ছোকরী। দোয়ারীর হাতে থাকে 'কামলিঙ্গ'। দুটি বাঁশের মাঝখানে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের গাছের বাঁকা ডালের মাথায় লিঙ্গাকৃতি করা হয়। একেই মদনের 'কামলিঙ্গ' বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে দুটি ঢোল, হারমোনিয়াম, আঁড়বাঁশী, মুখাবাঁশী ও জুড়ি। গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি মাঙ্গনের সময় এই দলটি চটুল বা খ্যামটা সুরে দ্রুত লয়ে গান পরিবেশন করে। এরা কামঠাকুরের গান ছাড়াও সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে গান রচনা করে থাকেন।

মদন উৎসবের অপর একটি ধারা হল পালাগান বা জাগগান। এ ধরনের গানকে জাগগান বলা হয় কেন এ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। সুখবিলাস বর্মার মতে, "কামকে জাগানোর কথা ও অঙ্গভঙ্গি জড়িত বলেই বোধ হয় এই গানের নাম জাগ গান।"[৪৩] আবার অনেকে মনে করেন, এই গান রাত জেগে গাওয়া হয়, তাই একে জাগগান বলে। তবে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, যে দলের গানবাজনা কামদেবকে জাগ্রত করে অর্থাৎ মানুষের কাম ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে, তাকে জাগ গান বলে। বন্দনা দিয়ে জাগ গানের শুরু হয়। যেমন–

'ও রে বন্দং জগৎ গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু দয়াল হরি হে
ও রে দীন দয়ালের ভরসা হরি
তোর চরণ তুলি দে মোর মাথে
ভক্তি করঙ হরি নারায়ণে
ওরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃষ্টি স্থিতি লয়
সৃজন পালন মরণ বাঁচন
তিন জনাতে হয় হে।

ও রে সভাত দাঁড়েয়া রে মুই
সগারে চরণ বন্দং ভাবিয়া ঈশ্বর
ও রে সভা করিয়া বসিয়া আছেন
তোমরা দশজনা
দশের চরণত মুই পরনাম জানাঙ্
নানান জাতের আছেন হেন্দু মোছলমান
সগারে চরণ বন্দং ভাবিয়া নিরঞ্জন।।
এ হে বন্দনা গানের কাথা রইল ভালে ভালে
শিরি রাধার মান ভঞ্জনের কাথা এলা
শুনিয়া ন্যাও সকলে।।'

সংগ্রহসূত্র ঃ জীতেন বর্মন (৫৭), ১৬৪ গোপালপুর,
জামালদহ, কোচবিহার।

এই দল সারারাত জেগে থাকার জন্য জাগগানের ব্যবস্থা করে। জাগগানের দলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– ছোট ও বড় জাগের দল এবং ডাকালী ডাংগা বা মোটা জাগের দল। ছোট ও বড় জাগ দলের পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালাগিরিবর পাঁচালি, কানাই ধামালি, রাধা ধামালি, দোয়ারী-ছোকরা ধামালি, ভাঙ্গা টিনের বাঁকালি প্রভৃতি। মূল গানের মাঝে দর্শক ও শ্রোতাদের ড্রামাটিক রিলিফ দেওয়ার জন্য গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কুকীর্তি ও কেচ্ছা বর্ণনা করে। "গ্রামে সারাবছর কী ধরণের ঘটনা ঘটেছে – কোন্ "মহাপুরুষ" কী অপকর্ম করেছেন– অর্থাৎ ভালো মন্দ ঘটনার উল্লেখ ও বিবরণ কবিত্বগুণসম্পন্ন শিল্পীরা মুখে মুখে রচনা করে তাতে সুর সংযোজন করে এই উৎসবে পরিবেশন করে।"[৪৪] আবার ডাকালী ডাংগা দলকে অনেকে মোটা জাগের দল বলে থাকেন। এই দলের গানগুলি যৌন আবেদনমূলক ও কুরুচিপূর্ণ হওয়ায় অল্পবয়স্ক বালক এবং মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। জাগের পালাগুলিতে গীদাল, মতিহারি ও মহিলাবেশধারী ছোকরী মিলে বিভিন্ন ধরনের কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে দর্শক ও শ্রোতার মনোরঞ্জন করা হয়।

অনানুষ্ঠানিক লোকনাটক ঃ

আনুষ্ঠানিকরূপে লোকনাটকের উদ্ভব হলেও এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে মূলত অনানুষ্ঠানিকরূপেই। তাই আনুষ্ঠানিক বা পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক লোকনাটক দেখা যায়। লোকনাটকগুলি Myth ও Ritual-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবটি অর্থাৎ পূজা-পার্বণ-ব্রত এসবের গন্ডী পার করতে সচেষ্ট হয়েছে। ফলে যত দিন যাচ্ছে তত ধর্মনিরপেক্ষ

হয়ে মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছে লোকনাটক। এর মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের পারিপার্শ্বিক সমাজ। লোকনাটকের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে সমাজ, পুরাণ, কল্পনা, রোমান্স প্রভৃতি। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য গড়ে ওঠা এই লোকনাটকগুলিকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন– (ক) সামাজিক বিষয় নির্ভর, (খ) পৌরাণিক বিষয় নির্ভর ও (গ) কাল্পনিক বা রূপকথাশ্রিত বিষয় নির্ভর।

সামাজিক বিষয় নির্ভর লোকনাটক ঃ

সামাজিক বিষয় নির্ভর লোকনাটকের কাহিনি গড়ে ওঠে সমাজকে কেন্দ্র করে। সমাজের ভালো-মন্দ দুটি দিকই তুলে ধরে জনসাধারণকে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন করা হয় এ ধরনের লোকনাটকে। এগুলি একদিকে যেমন জনমনোরঞ্জনকারী, অপরদিকে নীতিশিক্ষামূলক। "সমাজের মানুষজনকে আনন্দদান, গোষ্ঠী-চেতনার-বিস্তার, সরাসরি গুরুমশায়গিরি না করেও লোকশিক্ষার ব্যবস্থা এসব যেমন লোকনাট্যের মাধ্যমে সাধিত হয়, তেমনি সামাজিক ন্যায়-নীতির আদর্শটিও লোকনাট্যে রক্ষিত হয়।"[৪৫] তাই প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকনাটক অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, শোষণ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ধরনের লোকনাটকের নায়ক-নায়িকা মূলত গ্রামের সাধারণ নর-নারী। গ্রামজীবনের টুকরো টুকরো ছবি এতে ধরা পড়ে। পালাকারেরা গ্রামীণ চলমান জীবনের কোন আবেগঘন বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ঘটনাকে পালাগানে রূপ দেয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত নানা ধরনের সংবাদ এর মাধ্যমে দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে এসে পৌঁছয়। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির বিষয় হল, পালাগুলিতে দুষ্ট ও খল চরিত্রগুলিকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নৈতিকতার মান বৃদ্ধি করা হয়। যা দর্শক ও শ্রোতার মনকে প্রভাবিত করে। যাই হোক, সামাজিক লোকনাটকের গুরুত্ব জনমানসে যে অপরিসীম তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সামাজিক বিষয় নির্ভর লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম পালাটিয়া, চোরচুন্নি, গমীরা, খন, গম্ভীরা, আলকাপ, ডোমনী প্রভৃতি।

পালাটিয়া ঃ পালাটিয়া লোকনাটক জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এর সমতলভূমি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক পালাটিয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে 'পাঁচালি গান' বলিতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নাট্য-কাহিনীকে বুঝায়। কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র সম্বলিত নাট্য-কাহিনীকে বাঙলায় 'পালাগান'-ও বলা হয়। 'পালা'-র সহিত 'টিয়া' এই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে উহাকে 'পালাটিয়া গান'-ও বলা হইয়া থাকে। 'পাঁচালি' গানেরই অপর নাম 'পালাটিয়া গান'।"[৪৬] কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিংবা বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিযোগীতার উদ্দেশে একদিন বা তার বেশি সারারাত ধরে পালাটিয়া গান অনুষ্ঠিত হয়। আবার পালাটিয়া কখনও কখনও ধামগুলিতেও উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এ থেকে অনেক

সমালোচক পালাটিয়া গানকে ধামগান বলেছেন। তবে 'ধাম' বলতে দেবস্থানকে বোঝায়। "সাধারণত বিশেষ-বিশেষ উৎসবে অথবা কয়েকটি গ্রামের নাট্যদলের অভিনয় প্রতিভার উৎকর্ষ বিচারের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক রাত্রিব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হইয়া থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় তাহাকে বলে 'ধাম'। 'ধাম' ছাড়া বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে পালাটিয়া গানের আসর বসিয়া থাকে।"[৪৭] আবার শিশির মজুমদারের মতে, "দেবতার অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলে বলা হয় ধাম। ...ধামে শুধুমাত্র পালাটিয়া নয়, অন্যান্য যে সব 'গান' উপস্থিত করা হয় তাকেও ধামগান বলা হয়।"[৪৮] সুতরাং ধামে যেহেতু পালাটিয়া ছাড়া অন্যান্য গান উপস্থাপিত হয়, তাই পালাটিয়াকে ধামগান বলা যায় না।

২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে পালাটিয়ার দল গঠিত হয়। দলকে যিনি পরিচালনা করেন, তাঁকে বলা হয় হাঁদি। আর যিনি পালার কাহিনি রচনা করেন, তিনি হলেন ওস্তাদ। কোন কোন সময় এঁরা একই ব্যক্তি হতে পারে। আবার কখনও হাঁদি ওস্তাদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে কাহিনি সংগ্রহ করেন। তবে ওস্তাদের কাছে মূল কাহিনি ও সংশ্লিষ্ট গানগুলিই কেবল লিখিত থাকে। সেখানে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ লেখা থাকে না। এক্ষেত্রে কুশীলবেরা অভিনয় চলাকালীন আসরে উঠে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা ও পরিবেশন করেন। দেবস্থান বা ধাম ছাড়া গৃহস্থের উঠোনেও পালাটিয়ার আসর বসে। এর আসর সাধারণত গোলাকার হয়। আসরের ওপর চট বা ত্রিপলের আচ্ছাদন দেওয়া থাকে। আসরের মাঝখানে বসেন বাদ্যযন্ত্রী ও কুশীলবেরা। পালাগান পরিচালনা করেন হাঁদি। তিনি বন্দনা দিয়ে গান শুরু করেন। এছাড়া থাকে দোহার বা বতেয়া ও ছুকরী। আগেকার দিনে সমস্ত চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করত। কিন্তু এখন নারীচরিত্রে নারীদেরও অভিনয় করতে দেখা যায়। বতেয়া ও ছুকরী ছাড়া অন্যান্য কুশীলবেরা খুব সামান্য মেক-আপ নেয়। তবে পালা চলাকালীন অভিনেতারা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আসরেই বসে থাকেন। যার যখন অভিনয়, সেখান থেকে উঠে সংলাপ বলে আবার বসে পড়েন। পালাটিয়ার অভিনয়ে নির্মলেন্দু ভৌমিক-এর মতে একটি বিশেষত্ব রয়েছে সেটি হল, "যখন গানের মধ্যে দিয়া নায়ক বা নায়িকা পরস্পরকে কিছু বলিতেছে, তখন কখনই সেই গান সে একা গাহিবে না, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে। ... বক্তা ও শ্রোতা একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তরাংশ গাহিয়া থাকে।"[৪৯] অর্থাৎ পালাটিয়ায় যার উদ্দেশ্যে সংলাপ, তিনিও সেই গানে গলা মেলান। এখনও পর্যন্ত এই রীতিটি পালাটিয়ায় প্রচলিত রয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুসারে তিন ধরনের পালাটিয়া দেখা যায়, যথা– রঙ্ পাঁচাল, খাস পাঁচাল ও মান পাঁচাল। রঙ্ পাঁচালে প্রেমই মুখ্য। তবে তা কাল্পনিক। "রঙ্ পাঁচালি'-তে যে প্রেম-কাহিনী থাকে, সেই কাহিনীর সবটাই কাল্পনিক। প্রেমের সহিত হাস্যরসের খোরাক জোগাইবার জন্য ইহার মধ্যে নিছক রঙ-কৌতুকও কিছু ভরিয়ে দেওয়া হয়।"[৫০] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "হাস্যরস দিয়ে তার সূচনা, হাস্যরসে তার শেষ। কিন্তু তার অন্তরালে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী আছে, তা বাস্তবজীবন ভিত্তিক।"[৫১] অর্থাৎ রঙ্পাঁচালে কল্পনা মেশানো প্রেম

হাস্যরস কিংবা রঙ্গরসের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। গিল্টিমিঞা ভেজালশ্বরী, হ্যাজাকবাবু মেন্টালশ্বরী প্রভৃতি রঙ্পাঁচালের পালার উদাহরণ।

খাস পাঁচালের কাহিনিতে সমাজের প্রতি শ্লেষ ও ব্যঙ্গই প্রাধান্য লাভ করে। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, " 'খাসপাঁচালি' হইল নিকট বা দূর অতীতে নিজ বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘটিয়া যাওয়া কলঙ্ক-কাহিনীর নাট্যরূপ।"[৫২] সুতরাং এই পালাগানে অতীতে ঘটে যাওয়া নিজের বা কাছাকাছি কোন অঞ্চলের কলঙ্কজনক ঘটনা ফাস করে দেওয়া হয়। তবে এতে কেবল সামাজিক ঘটনা নয়, বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাও এতে স্থান পায়। যেমন– ভেষ্টেশ্বরী পালা, দশ নম্বর আরি ঢেনা অধিকারী প্রভৃতি খাস পাঁচালের উদাহরণ।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হয় মান পাঁচাল। পালাটিয়ার এই ভাগে পুরাণ ও শাস্ত্র আলোচনা করা হয় বলে একে 'শাস্তোরী' গানও বলা হয়। 'ইহা মূলত পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। পুরাণ বা 'শাস্ত্র' গানও বলা হইয়া থাকে। মান পাঁচালি গানের মধ্যে কাহিনী ও আসরের বিশেষ গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলা হয়। ...'মান' অর্থাৎ সম্ভ্রম করিয়া, গাম্ভীর্য-পূর্ণ পরিবেশে যে নাট্য-কাহিনীর অভিনয় করা হয়, তাহাকেই বলে 'মান পাঁচালি'।"[৫৩] উল্লেখ্য মান পাঁচালে কাহিনি ও চরিত্র অপেক্ষা শাস্ত্রীয় আলোচনাই প্রধান। জ্ঞানবালা ও পটপটি গোঁসাই, সিরাজদৌল্লা প্রভৃতি মান পাঁচালের উদাহরণ।

চোরচুন্নি ঃ উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকনাটক হল চোরচুন্নির গান। এই চোরচুন্নি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। সাধারণত কালীপূজার আট থেকে দশ দিন আগে চোরচুন্নির দল বাড়ি বাড়ি পালাগান গেয়ে বেড়ায়। চোরচুন্নি গানের উৎসমূলে রয়েছে একধরনের জাদুধর্মীয় লোকবিশ্বাস। লোকসমাজে এর প্রচলিত লোকবিশ্বাসটি হল, মহালয়ার দিন কোন গৃহস্থের বাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি করে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন সেটা গৃহস্থের অলক্ষে চুপ করে ফিরিয়ে দিয়ে এলে সারাবছর ধরে ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ চোরটি সাফল্যের সাথে চুরি করতে পারবে। এই চোরচুন্নি প্রসঙ্গে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা রাখিয়া রচিত চোরচুন্নীর গানগুলি সুন্দর। জীবনের আনন্দ-বেদনা, সরস উষরতা, নির্নিরীক্ষ্য কোমলতা, স্নিগ্ধ কারুণ্য, চিরদুর্লভ প্রেম, অপ্রাপনীয় সুখ, মর্মান্তিক বিরহ, সবই এই গানগুলির সুরে ও শব্দে চিত্রিত হইয়াছে।"[৫৪] আবার সনৎকুমার নস্করের মতে, "চোর-চুন্নি গানের উৎসে ছিল চৌর্যবৃত্তি। কিন্তু বর্তমানে সেই বৃত্তিকে পটভূমিতে রেখে কৃষকজীবনের সুখদুঃখের কথাই বেশি উঠে আসে এ ধরনের গানে।"[৫৫] অর্থাৎ এই চোরচুন্নি গানে চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি ফুটে ওঠে।

১০-১৫ জন কিশোর ও যুবকদের নিয়ে এক-একটি চোরচুন্নির দল গঠন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন একজন মূল গায়েন, কয়েকজন দোহার, ছোকরা ও বাদ্যযন্ত্রী। আগে মূল গায়েনই চোর ও চুন্নি উভয় ভূমিকায়

অভিনয় করতেন । কিন্তু এখন দলের মধ্যে কোন একজনকে বিচিত্র ধরনের বেশে চোর এবং আর একজনকে শাড়ি-গয়না পরিয়ে চুন্নি সাজানো হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে খোল, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশী প্রভৃতি। চোরচুন্নির দল এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ির উঠোনে নাচ, গান ও অভিনয় দেখিয়ে বেড়ান। গৃহস্থেরা খুশি হয়ে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শস্য কিংবা নগদ অর্থ প্রদান করেন। মূল গায়েন আসর বন্দনার মাধ্যমে চোরচুন্নি গানের সূচনা করেন। বন্দনা অংশে হিন্দু দেবতার পাশাপাশি মুসলিম পীরের উদ্দেশ্যেও স্তুতি করা হয়। চোরচুন্নি গানে হিন্দু-মুসলমানের এই পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়, "চোর-চুরণী পালাগান এমন রসের বিষয় ও অসাম্প্রদায়িক ও উপভোগ্য, রমণীয় যার ফলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলী এই আসরে উপস্থিত থেকে চোর-চুরণী পালার রসাস্বাদন করেন।"[৫৬] অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় চোরচুন্নি পালার গানগুলি পরমানন্দে উপভোগ করে। আসর বন্দনার পর চোরচুন্নির গানগুলি চাপান ও উতোর রীতিতে পরিবেশিত হয়। চোরচুন্নির গানে গদ্য সংলাপের ব্যবহার খুব কম, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গীতই সংলাপের ভূমিকা নেয়। যেহেতু চোরচুন্নি প্রান্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় (জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে) প্রচলিত, ফলে এই অঞ্চলগুলির রাজবংশী কথ্যভাষা ও সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "চোর-চুরণী পালায় যে গানগুলি গাওয়া হয়, সেগুলির সবই ভাওয়াইয়া। পালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ভাওয়াইয়া গান প্রয়োগ করা হয়।"[৫৭] প্রতি বছর নতুন নতুন গান রচনার পাশাপাশি পুরনো অনেক জনপ্রিয় গানও এতে স্থান পায়। পালাটিয়ার মতই চোরচুন্নিতেও যার উদ্দেশে সংলাপ, তিনিও বক্তার সাথে সাথে গান গেয়ে থাকেন।

চোরচুন্নি গানকে বিষয়বস্তু অনুসারে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম অংশে রয়েছে চোরচুন্নির সুখ-দুঃখে ভরা গার্হস্থ্য ও দাম্পত্যজীবন।

'চুরনি — (গোর) ওরে মনের কথা তোক রে চড়া
কবার চাছ মুই আজি
ওরে মোক কনেক দেখেয়া আনেক বড় ভান্ডানি।

চিতান — আহার এই সন কনেক নিগারে মোক
ও চড়া বড় ভাণ্ডানি
ওরে কত মানসি জাছে চড়া
মটরত চরি কেমন হই হই করি।

চোর — (গোর) ওগে তোর কথা শুনিয়া চুন্নি হাসি বিরাছে মোর
ওগে প্রতেকবার দেখিছিত ঠাকুর
হাউস নাই মিটে তোর।

চিতান— ওগে বছরে বছরে চুন্নি গে ও তোক নিগাছ মলানি
ওগে এক বছরে না ছারিস পিচ্ছা
জাছিত ভাণ্ডানি ও তুই মটরত চরি।'

সংগ্রহসূত্র ঃ যতীন্দ্রনাথ রায় (৫৮), সাং চক মৌলানী,
মালবাজার, জলপাইগুড়ি।

চোর ও চুন্নির নিরপেক্ষ কথোপকথনের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হয় দ্বিতীয় অংশে। তৃতীয় অংশে চোর লীলারসিক কৃষ্ণে এবং চুন্নি শ্রীরাধায় উন্নীত হয়েছেন। এই অংশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এভাবে, "চোর-চুরণী গানের বেলায় এই সম্প্রসারণ ঘটেছে বিষয়ের দিকেও বটে, আবার বিষয়ের ব্যাখ্যার দিকেও বটে। যেমন— 'চোর' বলতে লৌকিক চোর থেকে ননীচোরা বাল্যলীলার গোপাল এবং তার থেকে বস্ত্রহরণকারী পূর্ণবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ।"[৫৮] আবার অঞ্চলবিশেষে চোরচুন্নি গান চকচুন্দী, নটুয়া চকচুন্দি প্রভৃতি নামে পরিচিত। চোরচুন্নির গানগুলিতে চোরেদের জীবনের আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি দিকগুলি কবিরা তাদের সহজাত দক্ষতায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে চোরচুন্নি সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে লোকসাধারণকে সচেতন করে লোকসাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করে থাকে । এদিক থেকে বিচার করলে চোরচুন্নির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গমীরা ঃ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সমাজে গাজন ও চড়ক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় গমীরা খেলা। চৈত্র সংক্রান্তির প্রায় এক সপ্তাহ আগে, আবার কোন কোন অঞ্চলে দশ-বারো দিন আগে গমীরা নামক ব্রতানুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজার মধ্য দিয়ে গমীরার সমাপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে দেউসি বা দেউড়ি মন্ত্রপুত জল দিয়ে ১০-১২ জন যুবককে নির্বাচন করেন। তাদের শিবের ভক্ত বা 'খেলটুক' বলা হয়। 'ফটা মারার দিন' বা শিবঠাকুরকে জাগানোর দিন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঢাকের বাজনার তালে গমীরা দলের যুবকেরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। সমালোচকদের মতে, 'গমীরা' শব্দটি এসেছে 'গম্ভীরা' শব্দ থেকে। যেমন– গম্ভীরা > গম্মীরা > গমীরা। রাজবংশীদের উচ্চারিত ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়ে পরবর্তী ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘতর হয়েছে। "গমীরা নামটির সঙ্গে গম্ভীরা শব্দের কোন না কোন ভাবে যোগ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, উত্তরবাঙলার লোকসংস্কৃতির উপকরণ সাধারণত উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। লৌকিক শৈবধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং গমীরা শব্দটিই ক্রমে সংস্কৃতের প্রভাবের বশবর্তী হইয়া গম্ভীরায় পরিণত হইয়া থাকিবে, গম্ভীরা শব্দ হইতে গমীরার উৎপত্তি হয় নাই তাহা সত্য।"[৫৯] সুতরাং গম্ভীরা শব্দটি

যুক্তাক্ষর লোপ পেয়ে গমীরা হয়েছে কিংবা গমীরা শব্দটি সংস্কৃতায়িত হয়ে গম্ভীরায় পরিণত হয়েছে, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তবে আর যাই হোক, মালদহ জেলার গম্ভীরার সাথে গমীরার পার্থক্য লক্ষণীয়। গমীরা শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগে এবং শেষ হয় চৈত্র সংক্রন্তির দিনে। এছাড়া নৃত্য-গীতের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মালদহের গম্ভীরা ও অন্যান্য অঞ্চলের গমীরা খেলা উভয়ই শৈবানুষ্ঠান—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গমীরার দল অনেক সময় কাহিনিধর্মী কতগুলি গান এবং অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালনের মাধ্যমে এক একটি পালা পরিবেশন করে। কোথাও কোথাও গমীরার দলের লোকেরা কাঠের এবং শোলার মুখোশ পরে শিব ও কালী এবং কয়েকজন নর্তক-নর্তকী সেজে নাচ ও গান পরিবেশন করে। শিব চরিত্রটির উপস্থাপনা থাকলেও শিবকে কেন্দ্র করে কোন সঙ্গীত পরিবেশিত হয় না। বন্দনা দিয়ে মূল গায়েন গান শুরু করলে অন্যান্য সঙ্গীরা সেই গানের ধুয়া ধরেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে দোতরা, ঢোল, বাঁশী, খোল, করতাল প্রভৃতি। গমীরা গানের কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই। গম্ভীরা গানের বন্দনা অংশে শিবের ভূমিকা রয়েছে। শিবকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরা হয়। কিন্তু গমীরায় শিবের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। গাজন উপলক্ষে এই গমীরা পালা অনুষ্ঠিত হলেও এর বিষয়বস্তু ধর্মনিরপেক্ষ। গমীরার কোন আসর হয় না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে এর অভিনয় হয়। তাই গমীরা গানে স্থান পায় সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা। আবার কখনও কখনও আদিরসাত্মক বা প্রেমমূলক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

খন ঃ 'খন' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে, এ নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন, " 'খন' শব্দটি সংস্কৃত 'ক্ষণ' থেকে এসেছে।"[৬০] কারণ এই গান তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়। আবার নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, " 'খন' কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'খণ্ড' থেকে। খণ্ড> খন্ন > খন। উত্তরবঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়ে শেষে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। Episode অর্থাৎ খণ্ড কাহিনী থেকে।"[৬১] এ প্রসঙ্গে শিশির মজুমদারও বলেছেন যে, " 'খণ্ড' হলো ঘটনা। একটি নির্দিষ্ট কৌতুহলজনক ঘটনা বোঝাতে সাধারণ বাংলায় 'কান্ড' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ একটা কান্ড হয়েছে। তেমনি উক্ত অঞ্চলের দেশী-পলিরা বলেন 'খণ্ড'। ....এই খণ্ড যখন গানে বাঁধা পড়ে, তখন তা 'খন'।"[৬২] কিন্তু পুষ্পজিৎ রায় মনে করেন, " 'খন গান' হচ্ছে উৎসবের গান, উৎসবকালের গান, অবসর-অবকাশ বা বিরামকালের গান;"[৬৩] সুতরাং বলা যায়, এই 'খন' শব্দটি অঞ্চলবিশেষে বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে।

খন গান উত্তরবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বহুল প্রচলিত। অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাস পর্যন্ত চলে এই খন গানের আসর। আবার কোথাও কোথাও কার্তিক মাসের শেষের দিকেও এই পালা শুরু হয়। মোটামুটি ১২-১৫ জনকে নিয়ে একটি খনের দল গঠিত হয়। গ্রামের সম্পন্ন কোন গৃহস্থের

উঠোনে কিংবা উন্মুক্ত মাঠে এই খন গানের আসর বসে। আসর সাধারণত বৃত্তাকার হয়ে থাকে। এই বৃত্তাকার আসরের চারিদিকে দর্শকেরা ঘিরে বসেন। বৃত্তাকার স্থানের মাঝে কুশীলব ও বাদ্যযন্ত্রীদের স্থান। ঢোল, ডুগি, তবলা, বাঁশী, করতাল, খোল, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয় এই পালানাটকটিতে। আসরে হাস্যরসের যোগান দেয় 'ওসিয়া' অর্থাৎ 'রসিয়া'। 'ওসিয়া' চরিত্রটি মুখে সাদা রঙ মেখে আসরে নামে। ছোকরা চরিত্রগুলিও নারীর মত বেশভূষা করে। গীদাল ও ওসিয়া চরিত্রদুটিকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। অভিনেতারা আগে অভিনয়কালে আসর থেকে উঠে অভিনয় করতেন। তবে বর্তমানে গ্রিনরুম বা সাজঘর ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। আসর থেকে সাজঘরে যাওয়া-আসার জন্য একটি সরু পথ রয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের পর বন্দনা দিয়ে খন গানের আসর শুরু হয়। বন্দনাংশে কালী, সরস্বতী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে মুসলিম পীর-পয়গম্বরদের উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর পালাগানের অভিনয় চলে। প্রতিবছর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নতুন নতুন পালা রচনা করা হয়। আবার কখনো কখনো বহু বছরের পুরনো কোন পালা দীর্ঘদিন সমান জনপ্রিয়তা লাভ করে। সংলাপ মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হলেও খনের গানগুলো প্রায় সবই লিখিত থাকে। তবে সংলাপ ও গানগুলি রচিত হয় আঞ্চলিক ভাষায়।

খন লোকনাটককে বিষয়বস্তুর দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— খিসা খন এবং শাস্তোরী খন। খিসা খন সাধারণত সামাজিক বা পারিবারিক নানাপ্রকার অবৈধ বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ঢাকোশোরী, সুমিতা যোগীর গান, মাইয়্যাবন্ধকী প্রভৃতি। অপরদিকে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলেও প্রেমের কাহিনিই মুখ্য হয়ে উঠেছে শাস্তোরী খন পালায়। যেমন— নয়নশোরী, বর্মোশোরী প্রভৃতি। এ ধরনের লোকনাটকে নায়কের তুলনায় নায়িকারই প্রাধান্য বেশি। তাই এই পালাগুলির নামকরণেও 'শোরী' অর্থাৎ নায়িকার নাম প্রাধান্য অর্জন করে।

গম্ভীরা ঃ গম্ভীরা লোকনাটক মালদহের ইংরেজবাজার, বামনগোলা, মানিকচক, হাবিবপুর, রতুয়া, কালিয়াচক প্রভৃতি থানায় প্রচলিত। মূলত চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন বা চড়ক পূজার চার-পাঁচদিন আগে থেকেই গম্ভীরা উৎসবের সূচনা হয়। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাই হল গম্ভীরা পালা বা লোকনাটক। শিবপূজাকে কেন্দ্র করে এই লোকনাটক গড়ে উঠলেও ধর্মকে ছাপিয়ে সামাজিক, কখনো বা রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এতে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এখন চৈত্রসংক্রান্তি ছাড়া অন্যান্য মাসেও গম্ভীরা পরিবেশিত হয়।

'গম্ভীরা' শব্দটির উৎস নিয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে এই 'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ হল 'বাড়ির অন্তঃপ্রকোষ্ঠ'। তবে এই শব্দটি চৈতন্যযুগে বিশেষ অর্থে প্রচলিত ছিল। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃত'- এ আমরা পাই—

(ক) "গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা-লব।" [৬৪]

(খ) "গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল।"[৬৫]

গম্ভীরা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "গম্ভীরার গান এক অতি জনপ্রিয় লোকনাট্য, তার এই নাম, কারণ সাধারণতঃ লৌকিক সূর্যোৎসব বা শিবের গাজন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । শিবের গাজন বা সূর্যোৎসবকে এই অঞ্চলে গম্ভীরা বলে।"[৬৬] আবার 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থের রচয়িতা হরিদাস পালিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন গম্ভীরার অর্থ শিবমন্দির । তাঁর মতে, "পূর্ব্বকালে চন্ডী-মন্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে এতদ্‌ঞ্চলে গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত। ...সেই গম্ভীরাতেই শৈব প্রভাবকালে 'হরগৌরীর' পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়।"[৬৭] তিনি আরও বলেছেন, "পূর্ব্বে শিবালয় গম্ভীর বা পঙ্কজ দ্বারা শোভিত হইত। ইহাই তাহার গম্ভীরা নামোৎপত্তির অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।"[৬৮] তবে এ প্রসঙ্গে প্রদ্যোত ঘোষ মনে করেন, "সূর্যপূজা পরবর্তী পর্যায়ে শৈবধর্মের প্রভাবে আদিবাসীদের হাতে গম্ভীরা নাম নিয়েছে— একথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা।"[৬৯] বাংলাদেশের যশোহর-খুলনা অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় গাজনের শিবের ঘরকে 'গম্ভীরা ঘর' বলা হয়। চন্ডীমন্ডপের ন্যায় দেবতার মন্দিরগুলি ক্রমে শৈবপ্রভাবে শিব মন্দিরে পরিণত হয়েছিল। আর সেগুলিতে একসময় শিবপূজা প্রাধান্য পেয়েছিল বলেই সেগুলিকে 'গম্ভীরা' বলা হত। এখনও পর্যন্ত গম্ভীরার মন্ডপ কাগজের পদ্মফুল দিয়ে সাজানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এসব থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিবকে উপলক্ষ করে গাজন বা চড়কের সময় গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয়, আর এই উৎসবে শিব প্রধান ভূমিকা পালন করে। গম্ভীরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎসবগুলি চৈত্রসংক্রান্তির চারদিন আগে থেকেই শুরু হয়। এগুলি যথাক্রমে— ঘটভরা, ছোট তামাসা, বড় তামাসা এবং সবশেষে আহারা ও বোলবাই।

গম্ভীরার আসর সাধারণত বৃত্তাকার হয়। গোলাকার অংশের চারদিকে গোল করে দর্শকেরা বসে থাকেন। মাঝে বসেন কুশীলব ও বাদ্যযন্ত্রীরা। জায়গাটি চট, ত্রিপল বা পলিথিন দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। এই পালায় পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলা, ডুগী, বাঁশী, হারমোনিয়াম প্রভৃতি প্রধান। গম্ভীরা লোকনাটক কয়েকটি পর্যায়ে পরিবেশিত হয়। যথা— ক) মুখপাদ, খ) বন্দনা, গ) ডুয়েট ও চারইয়ারী, ঘ) পালাবন্দী গান, ঙ) রিপোর্ট বা সালতামামি। প্রতিটি চরিত্র মুখপাদ পর্যায়ে আসরে এসে গানের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যান। এই পর্যায়ের প্রথম অংশের নাম ধুয়া এবং দ্বিতীয় অংশের নাম চিতানি।

বন্দনা পর্যায়ে একজন শিব সেজে আসরে উপস্থিত হয়। এই পর্যায়ে মূলত থাকে শিববন্দনা। অন্যান্য চরিত্রেরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে শিবের কাছে তাদের সমস্যা ও অভিযোগ তুলে ধরেন। গম্ভীরা পালাগানে বন্দনা পর্যায়ে এই শিব চরিত্রটিকে আনা হয়েছে অনেক পরে। জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, একসময় মালদহ জেলায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগমনের কথা শুনে সে সময়ের বিখ্যাত গম্ভীরাশিল্পী মোহম্মদ সূফী তাঁর সামনে গম্ভীরা পরিবেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। শিবের অপর নাম যেহেতু আশুতোষ, তাই মানব আশুতোষের সামনে একজনকে দেবতা আশুতোষ সাজিয়ে উপস্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কোন

এক কারণে স্যার আশুতোষ মালদায় আসতে না পারায় তাঁর এক প্রতিনিধি এসে হাজির হন। শেষপর্যন্ত মোহম্মদ সূফী সেই প্রতিনিধির সামনে পূর্ব-পরিকল্পিত গম্ভীরা পরিবেশন করেন।[১০] তখন থেকেই শিব চরিত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সাথে গম্ভীরায় পরম্পরা হিসেবে চলে আসছে।

ডুয়েট পর্যায়ে একজন পুরুষ ও একজন নারীচরিত্র থাকে। এক্ষেত্রে প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সামাজিক দিকগুলিকেই তুলে ধরা হয়। নারীচরিত্রে পুরুষেরাই মহিলা সেজে অভিনয় করে। অপরদিকে চারইয়ারীতে চারজন ইয়ার বন্ধুর সমাবেশ দেখা যায়। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে পালাটি এগিয়ে চলে। চরিত্রানুযায়ী তারা হাস্যরস সৃষ্টি করে। আবার দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য কখনো কখনো তারা ভাঁড়ামির আশ্রয় নেয়। অনেক সময় কৌতুক রসাত্মক অভিনয়ের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেওয়া হয় এই চারইয়ারীর মাধ্যমে।

ফণীগোপাল পালের মতে, গম্ভীরায় পালাবদ্ধ গানের প্রচলন করেছিলেন মোহম্মদ সূফী বা সূফী মাস্টার। সমসাময়িক কালে আলকাপের জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি আলকাপের গানের অনুকরণে গম্ভীরায় পালাবদ্ধ গানের প্রবর্তন করেন।[১১] এই পালাবন্দী গানে চারজনের বেশি চরিত্র থাকতে পারে। চরিত্রগুলির মধ্যে একজন উচিত বক্তা চরিত্র থাকে, যিনি জনগণের হয়ে জনগণের কাছে জনগণের কথা তুলে ধরেন। গম্ভীরা গানের পালা কখনো ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় না। এই পালার মাধ্যমে সমাজের কোন ঘটনা বা দুর্নীতিকে তুলে ধরা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ঘটনাই প্রাধান্য পায়। তবে পালাবন্দী গানের মাধ্যমে যেসব সমস্যা জনগণের কাছে উত্থাপিত হয়, তার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়।

গম্ভীরা পালার সবচেয়ে শেষ পর্যায় হল রিপোর্ট বা সালতামামি। এই পর্যায়ে দুটি চরিত্র সংলাপ ও গানের মাধ্যমে সেই বছরের সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ দর্শক ও শ্রোতার কাছে তুলে ধরেন। এখানে উল্লেখ্য যেখানে অর্থাৎ যে অঞ্চলে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়, সেই অঞ্চলের সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলীই সেখানকার গম্ভীরা গানে তুলে ধরা হয়। এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। মালদহ জেলার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর দলিল বলা যেতে পারে গম্ভীরার রিপোর্ট অংশটিকে। এই পর্যায়ের গান ও বিষয় প্রতিবছর পরিবর্তিত হয়। তাই কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গম্ভীরা চিরস্থায়ী হয় না।

আলকাপ ঃ 'আলকাপ' শব্দটির মধ্যেই এই লোকনাটকটির অনেক বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "আলকাপ পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, তাকে গ্রাম্য জীবনচিত্রভিত্তিক নাটকীয় নক্সা বলা যেতে পারে। আলকাপ শব্দটিতে সামাজিক ব্যঙ্গ বোঝায়; শব্দটি সম্ভবতঃ আরবি ভাষা থেকে গৃহীত।"[১২] 'আলকাপ' শব্দটি সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন, " 'আলকাপ' নামটি এসেছে উত্তরবঙ্গ থেকে। 'আল' প্রাচীন বাংলা শব্দ, এর অর্থ হল রঙ্গরস। 'কাপে'র অর্থও তাই কৌতুক নাটিকা। অতএব আলকাপের অর্থ রঙ্গরসাত্মক

নাটিকা।"[৭৩] আবার হরিপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, দেশী সব ভাষাতেই 'আল' শব্দ পাওয়া যায় বিভিন্ন অর্থে। আরবী 'আল' শব্দ মানে 'মস্তান', ফারসী মানে লাল রং, সীসা, মদ্য; বাংলা মানে হুল, কীলক, কন্টক, বেড়া ইত্যাদি। 'কাপ' কথাটি বোধহয় দেশী। অর্থ কৌতুককারী, ছদ্মবেশ, তামাসা, সং ইত্যাদি। অনেকে বলেন সংস্কৃতের কাপট্য থেকে 'কাপ' এসেছে। আল ও কাপ দুটো মিলে সূক্ষ্ম তামাসা, ধারালো কৌতুক, রঙ্গব্যঙ্গ অর্থ পাওয়া যায়। দেশী অর্থ দিয়েই এই ব্যাখ্যা মেলে। আর বিষয়ধর্মের দিক দিয়েও কোন অসুবিধা থাকে না।"[৭৪] সুতরাং অর্থ যাই হোক আলকাপ যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক লোকনাটক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও দিনাজপুর জেলা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বিহারের পূর্ব সীমান্ত সাহেবগঞ্জ এবং বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলকাপ লোকনাটকটি প্রচলিত। এই লোকনাটকটির অভিনয়ের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে দুর্গাপূজার পর থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এটি অভিনীত হয়। লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে ফাঁকা মাঠে মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করে আসর তৈরি করা হয়। এই আসর বৃত্তাকার বা বর্গাকার হয়ে থাকে। আসরের ওপর চট বা ত্রিপল টানানো থাকে। দলের লোকেরা এমনভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসে যাতে আসরের মাঝখানে অভিনয়ের জন্য দশ-বারো হাত জায়গা ফাঁকা থাকে। আলকাপের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে হারমোনিয়াম, ডুগি তবলা, করতাল প্রভৃতি। যিনি আলকাপের ছড়া, কাপ ও পালা রচনা করেন, তাকে খলিফা বলা হয়। এবং যে চরিত্রটি এই লোকনাটকে হাস্যরসের খোরাক জুগিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'ল্যাবার' বা 'লাব্বার'। মুর্শিদাবাদে একে আবার কপ্যা বা সঙাল বা সঙদার বলা হয়। এছাড়া থাকে দু'জন ছোকরা, চারজন দোহারকি, বাজানদার প্রমুখ নানান ধরনের কুশীলব। ১৫-২০ জন সদস্য নিয়ে একটি আলকাপ দল গড়ে ওঠে। ছোকরা ছাড়া অন্যান্য কুশীলবদের তেমন বেশভূষা দেখা যায় না। আলকাপ গানের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে, সেগুলি হল — (i) বন্দনা, (ii) বৈঠকী গান, (iii) ভোলার বন্দনা, (iv) কাপ বা আলকাপ, (v) ছড়া, (vi) পালাগান।

আসর বন্দনা শুরু হওয়ার আগে দু'বার যন্ত্রসঙ্গীত ও মাঝে জয়ধ্বনি করা হয়। খলিফার সাথে সাথে অন্যান্য কুশীলবেরা সমবেত কণ্ঠে বন্দনা গানের ধুয়া ধরেন। দেবী সরস্বতী ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীদের উদ্দেশেও স্তুতিমূলক গান গাওয়া হয়। স্তুতিমূলক গান হওয়ায় এই গানের ভাব ও ভাষা গম্ভীর হয়।

বৈঠকীগানে দর্শকদের আসরে ধরে রাখার জন্য মনোরঞ্জনমূলক গান ও নাচের ব্যবস্থা করা হয়। ছোকরাদের লাস্যময়ী নৃত্য এতে ফুটে ওঠে। বৈঠকী গানে সাধারণত প্রেমমূলক গানই প্রাধান্য পায়। গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝুমুর, খেমটা, টপ্পা, জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, কবিগান প্রভৃতি। আবার কখনো কখনো ওস্তাদ নিজেই গান রচনা করে সুর দিয়ে থাকেন।

'ভোলার বন্দনা' অংশে দলের খলিফা উঠে দাঁড়িয়ে শিবের বন্দনা শুরু করেন। এই বন্দনায় শিবের স্তুতির পাশাপাশি ব্যঙ্গ-কৌতুক, অভিযোগ ও সমস্যা তুলে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আলকাপের 'ভোলার বন্দনা' অংশের সাথে গম্ভীরার 'শিববন্দনা' অংশের অনেকাংশে মিল রয়েছে।

এরপর শুরু হয় আলকাপের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যায় 'কাপ' বা 'আলকাপ'। ল্যাবার ও ছোকরাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্ক ধরে সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। এই 'কাপ'-কে স্থানীয় ভাষায় 'চাঁচোর' বলা হয়। এই পর্যায়ে ল্যাবারের অভিনয় দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। এতে পারিবারিক অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমান প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও গ্রাম বা দেশের বিশেষ কোন ঘটনার সমালোচনা করা হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের মধ্যে বহু আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর মোড়লের কাছে যায় তারা। উল্লেখ্য আলকাপে মোড়লের ভূমিকা নেন খলিফা। শেষে মোড়ল সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেন।

'কাপ'-এর পরে শুরু হয় ছড়া কাটা। এক্ষেত্রে খলিফা কিংবা দলের অন্য কোন দক্ষ কুশীলব ছড়া কাটেন। এই ছড়াগুলি খলিফা নিজেই তৈরি করেন। কোনো কারণে ছড়া আগে রচিত না থাকলে আসরে উঠে তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করা হয়। একের বেশি দল আসরে উপস্থিত থাকলে কবিগানের মত চাপান-উতোরের সাহায্যে ছড়া কাটা হয়। ছড়াগুলি যে কোন বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে।

সবশেষে শুরু হয় আলকাপের পালাগানগুলি। বর্তমানে এগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে আলকাপে। এই পালাগুলির বিষয় সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও রোমান্স জাতীয় হলেও এক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়ই প্রাধান্য পায়। কারণ দর্শক ও শ্রোতার চিরপরিচিত সমাজজীবন থেকেই কাহিনিগুলি নেওয়া হয়। আর এতে লাব্বারের রঙ্গরস পরিবেশনের সুযোগ থাকে বেশি। পালাগানটির কাহিনির প্লট ও গান আগে থেকেই তৈরি থাকে। কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ লিখিত থাকে না। অভিনেতারা আসরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা করে পরিবেশন করেন।

তবে শিল্পী ঝাঁকসুর পরবর্তীকাল থেকেই আলকাপে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। আলকাপের প্রতিষ্ঠাতা বোনাকানা থেকে ঝাঁকসুর পূর্বসূরী পর্যন্ত আলকাপ তিনটি পর্যায়ে অভিনীত হত— আসর বন্দনা, দ্বৈতগীতি ও কাপ। কিন্তু শিল্পী ঝাঁকসু যাত্রার অনুকরণ করে আলকাপে নিয়ে আসেন পাঁচটি পর্যায় যা 'পঞ্চরস' বা 'পঞ্চরস অপেরা' নামে পরিচিত।

ডোমনী ঃ মালদহ জেলার উল্লেখযোগ্য লোকনাটকগুলি হল গম্ভীরা, আলকাপ, ডোমনী। তবে গম্ভীরা ও আলকাপের তুলনায় ডোমনী লোকনাটকটি আবহমান অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি প্রেমী জনসাধারণের কাছে খুব কম পরিচিত। এই ডোমনী গান মালদহ জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে জনপ্রিয়।

তবে বর্তমানে এই গান রতুয়া ও মানিকচক অঞ্চলে কোনক্রমে টিকে রয়েছে। বাংলা ও বিহারের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের লোকসমাজের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, জাতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক ধরনের মিশ্ররূপ লক্ষ করা যায়। আর এসবের প্রতিফলন যে ডোমনী গানে পড়বে তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তাই সম্ভবত ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণেই ডোমনী গান তেমন পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কেননা ডোমনী গানের ভাষা 'খোট্টা'। সাধারণত মালদার দিয়ারা অঞ্চলের অর্থাৎ ডোমনী প্রচলিত এলাকার স্থানীয় ভাষা 'খোট্টা'। প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ গীয়ারসনের মতে হিন্দি মগহী (মাগধী) উপভাষার একটি কথ্যরূপই হল 'খোট্টা' নামক বিভাষা। ফলে এই দিয়ারা অঞ্চলের বাইরে ডোমনী গানের ভাষা দুর্বোধ্য।

'ডোমনী'-র উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সুবোধ চৌধুরী কতগুলি সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন, তা এখানে তুলে ধরা হল। তিনি বলেছেন, (i) "এক্ষেত্রে সুপ্রচলিত একটি অভিমত এই যে, লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভের পর বেহুলা কর্তৃক তার শ্বশুর ও শাশুড়ির সংগে ডোমনারীর ছদ্মবেশে সাক্ষাতের ঘটনার সাথে এই গানের উৎপত্তি জড়িত।"[৭৫] (ii) "ডোম-নারীর জন্মগত নৃত্যগীত কুশলতা ও রঙ্গপ্রিয়তার ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে এই সংগীতধারা বিবর্তিত হতে হতে তার বর্তমানরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। ... এমত অনুমানের পেছনে কিছু যুক্তিগ্রাহ্যতা বিদ্যমান, চর্যাপদে দেখি ডোম পুরুষ ও নারী নৃত্যগীতে সুপটু ছিল।"[৭৬] (iii) "...বোলওয়াহির এই খোট্টা ধারা থেকে ডোমনির সৃষ্টি এবং ডোমনিকে তাই বোলওয়াহির উত্তরসূরী বলা যায়।"[৭৭] (iv) "মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের উর্বরতাসূচক যাদুবিশ্বাসের সংগে এই ডোমনি গানের যোগ থাকা স্বাভাবিক। প্রাচীনকালের কিছু কিছু ডোমনি গানে আদিরসাত্মক বিষয়ের খোলামেলা প্রকাশ দেখা যায়।"[৭৮](v) "...এককালের শরৎ ঋতুর বর্ষারম্ভের 'শবরোৎসব' আজ হয়ে উঠেছে বসন্ত ঋতুর বর্ষারম্ভের 'শিরুয়া' পরব। পুরনো দিনের ডোমনি গানের ছট্ বা বিক্ষিপ্ত পদগুলিতে আদিরসাত্মক বিষয়ের প্রাচুর্যের ব্যাখ্যাও এই সূত্রে পাওয়া যাবে।"[৭৯] সুতরাং বলা যায় ডোমনীর ঐতিহ্য ধরে লোকনাটকটিতে এই ডোমনী চরিত্রটির আবির্ভাব হয়েছে। এই চরিত্রটি গম্ভীরা লোকনাটকের শিব-এর মতোই প্রতীকি হয়ে উঠেছে।

তবে উৎস যাই হোক একসময় এই ডোমনী গানের আসর শিরুয়া উৎসব উপলক্ষে পরিবেশিত হত। এই অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিনটিকে শিরুয়া বলা হয়। শিরুয়া শব্দটি এসেছে সং, সংক্রান্তি শব্দ থেকে। অর্থাৎ শিরুয়া হল চৈত্র সংক্রান্তি। এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ডোমনী। তবে শিরুয়া উৎসব ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময় ডোমনী অভিনীত হয়। শিরুয়ার দিন ডোমনীর দল বাড়ি বাড়ি মাগন সংগ্রহ করেন। গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে খোলা আকাশের নিচে দিনের বেলায় এই আসর বসত। পালাগুলিও আকারে ছোট ছোট করা হত। কারণ যত বেশি বাড়িতে যাওয়া যাবে, উপার্জনও তত বেশি হবে। কিন্তু এখন মাগনের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়াতে পালার আকার বড় হয়েছে। ডোমনী গানের মহড়া শুরু হয় দোল পূর্ণিমার পর থেকে। আবার কোন কোন জায়গায় রামনবমীর সময় ডোমনীর মহড়া হতে দেখা যায়। ১০-১৫ জন সদস্য

নিয়ে ডোমনী দল গঠিত হয়। দলটি প্রতিবছর নতুন নতুন পালা তৈরি করে এবং সাথে পুরনো জনপ্রিয় পালাগুলিও ঝালিয়ে নেয়। সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেচ্ছা-কাহিনি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা ডোমনীর পালাগুলিতে স্থান পায়। ডোমনীতে একজন মূল গায়ক ও দু'জন নারী বেশধারী ছোকরা থাকে। এছাড়া একজন রঙ্গ-তামাশা করার জন্য ভাঁড় বা বিদূষক থাকে, তাকে লাবার বা জোকার বলা হয়। দলের মধ্যে কেবল ছোকরারাই মেক-আপ নেয়। এই গানের বাদ্যযন্ত্রগুলি হল— করতাল, ঢোল, হারমোনিয়াম, ফ্লুট, বাঁশি।

ডোমনী গানের দুটি অংশ রয়েছে, যেমন— আসর বন্দনা ও নাচারি বা লাচারি। আসর বন্দনার মধ্য দিয়ে ডোমনী গান শুরু করেন মূল গায়ক। বন্দনার আগে শুরু হয় যন্ত্রসঙ্গীত। এরপর আসরে উঠে মূল গায়ক ও ছোকরারা বন্দনা গান ও নাচ শুরু করেন। সঙ্গে দোহারকি ও বাজানদারেরা ধুয়া ধরেন। দিক্‌পতিদের বন্দনার পর হিন্দু দেবদেবীর সাথে মুসলিম পীর-পয়গম্বরদেরও বন্দনা করা হয় এই গানে। সবশেষে আসরে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর চরণ বন্দনা করা হয়।

নাচারি বা লাচারি অংশে থাকে ছোকরাদের গান ও নাচ। ছোকরাদের মধ্যেই একজন ডোমনী নামে পরিচিত হন। ডোমনীকে উদ্দেশ্য করে গান বাঁধা হয় এই অংশে। গম্ভীরার শিবের মতো ডোমনীর এই ভূমিকা লক্ষণীয়। নাচারির দ্বিতীয় ভাগে ডোমনীর আর কোনো ভূমিকা থাকে না। সমাজের বিশেষ কোনো কাহিনিকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় এই পালাগান, যা ডুয়েট বা লাচারি নামে পরিচিত। অন্যান্য লোকনাটকের মতো ডোমনীর ডুয়েট পালাগানে কোন লিখিত সংলাপ থাকে না। আসরে উঠেই সংলাপ রচিত ও পরিবেশিত হয়। তবে পালা চলাকালীন মাঝে মাঝে লাবার দর্শকদের রিলিফ দেওয়ার জন্য যে গদ্য সংলাপ পরিবেশন করেন, তাকে 'ছুট ডোমনী গান' বলা হয়। লাচারি অংশে পরিবেশিত পালাগুলিতে সমাজের অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করা হয়।

পৌরাণিক বিষয় নির্ভর লোকনাট্য ঃ

পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যের বিষয়কে অবলম্বন করে যে সমস্ত লোকনাটক রচিত হয়, তা পৌরাণিক লোকনাটক। এই লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল কুশান, বিষহরি, রাবান, নটুয়া প্রভৃতি। কিন্তু একসময় আশুতোষ ভট্টাচার্য কুশান, বিষহরা প্রভৃতি পৌরাণিক বা ধর্মীয় আখ্যানমূলক লোকনাটককে লোকনাটক হিসেবে গণ্য করেননি। তিনি বলেছিলেন, "কোনো পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্মপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলেও তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না। তার প্রধান কারণ, প্রত্যেকটি পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে এবং তাদের নিয়ে যে সব কাহিনী রচিত হয় তাদের বিষয়ে আমাদের মনের মধ্যে একটি অবিচল এবং অপরিবর্তনীয় সংস্কার আছে। তা বিসর্জন দিয়ে কিংবা তাকে যুগধারার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত করে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

কাহিনী কিংবা চরিত্রকে নতুন নতুন ভাবে রূপায়িত করা যায় না।"[৮০] অর্থাৎ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, লোকসাহিত্যের ধর্ম পরিবর্তনশীলতা, যেহেতু এই পৌরাণিক লোকনাটকগুলি তেমন পরিবর্তিত হয় না, তাই এদেরকে লোকনাটক বলা যায় না। তাছাড়া পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা রূপের জন্য চরিত্রগুলো সাধারণ মানুষের জীবন থেকে উঠে আসলেও এখানে চরিত্রগুলোর নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। তবে তাঁর এই মতটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে সনৎ·কুমার মিত্রের মন্তব্য স্মরণীয়। তাঁর মতে, "কুশান বা বিষহরা ইত্যাদি পুরাণ বিষয়ক পালা। কিন্তু পুরাণ-কাহিনী হলেই যে সত্যমূলক হবে না, তা 'কৃত্রিম' হবে, তাতে জীবনের উত্তপ্ত আবেগের ছোঁয়াচ আদৌ থাকবে না তাই বা কেমন করে হয়। পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে থেকেই 'লোক'-সাধারণ আপন জীবন-সংসার ও সমাজের সত্যকে অন্বেষণ করে সেখান থেকে আহৃত সত্যকে নিজেদের জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়। অতএব এই সত্য দৈনন্দিনতার ধূলা-মালিন্যযুক্ত না হলেও তা 'সত্যমূলক'।"[৮১] তাই এগুলির মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের সুখ-দুঃখের একান্ত নিজস্ব কথা। পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যের চরিত্রেরা লোককবির হাতে পড়ে হয়ে ওঠে সাধারণ গ্রাম্য নরনারী।

অনেক সময় দেখা যায়, এ ধরনের লোকনাটকের অভিনয় চলাকালীন চরিত্রগুলি হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় অর্থাৎ অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা জেগে ওঠে। এগুলিকে বলা হয় 'ফাস' বা 'ফ্যাসা'। এই ফাসের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গ করা হয়। তাই পৌরাণিক পালার গুরুগম্ভীর বিষয়ের মাঝে মাঝেই 'ফাস' অভিনীত হতে দেখা যায়। যাই হোক এ প্রসঙ্গে আমরা শিশির মজুমদারের মন্তব্য এখানে তুলে ধরতে পারি, "...ধর্মীয়-পৌরাণিক বিষয়ের পালাগানগুলিতে যুক্ত হয়ে পড়ে এমন সব বিষয় যা লোকসমাজেরই নিজস্ব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। নদীয়ার বোলান বা দিনাজপুরের রামবনবাস পালায় রাবণের প্রহরীরা নিজেদের চুক্তিবদ্ধ কৃষি-শ্রমিক হিসাবে দেখে, আর তাদের চোখে রাবণ হয় জোতদার।"[৮২] তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা জরুরি, সেটি হল– পৌরাণিক লোকনাটকগুলি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে টিকে রয়েছে এবং তা ভবিষ্যতেও হয়ত টিকে থাকবে অন্যরূপে। কারণ, আমাদের প্রচলিত ঐতিহ্য ও সংস্কারগুলি আমাদের জীবন ও সমাজ থেকে কখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না, পরিবর্তিত হয়।

কুশান ঃ কুশান শব্দটি কোথা থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, "কুশান শব্দটি সংস্কৃত কুশীলব শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। কুশীলবই বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম প্রচারক।"[৮৩] উল্লেখ্য রামায়ণে রামচন্দ্রের সভায় লবকুশ বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গান গেয়েছিল বীণা সহযোগে। কুশান গানও বেণা অর্থাৎ বীণা সহকারে গাওয়া হয় বলে একে বেণাকুশানও বলা হয়। তাই সমালোচকদের মতে, "কুশ থেকে কুশান শব্দটির উৎপত্তি।"[৮৪]

কুশান লোকনাটকটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, সীমান্তবর্তী অসমের গোয়ালপাড়া জেলা ও বাংলাদেশের রঙপুর জেলার রাজবংশী জনসমাজে বহুল প্রচলিত। আশ্বিন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কুশানের অভিনয় চলে। গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে কিংবা গ্রামের খোলা মাঠে এর আসর বসানো হয়। আসর বৃত্তাকার হয়ে থাকে এবং দর্শকেরা আসরের চারদিক ঘিরে বসেন। দর্শকদের সামনে বসে বাদ্যযন্ত্রী, তাদের সামনে থাকে গীদাল, দোহার, ছোকরা ও অন্যান্য চরিত্রেরা। অন্যান্য লোকনাটকের মতোই চট বা ত্রিপল দিয়ে আসরের উপর আচ্ছাদন দেওয়া হয়। অস্থায়ী সাজঘর বা গ্রিনরুম নির্মাণ করা হয় আসরের কাছাকাছি কোন স্থানে। ১০-১৫ জনকে নিয়ে কুশান দল গঠিত হয়। তবে কুশান গানে প্রধান ভূমিকায় থাকে মূল বা গীদাল। তিনিই সংলাপ ও গানের মাধ্যমে পালাটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর হাতে থাকে একটি ব্যাণাযন্ত্র। পালার সূত্রধরের ভূমিকায়ও তিনি অবতীর্ণ হন। কুশান গানের বিষয়বস্তু রামায়ণ ছাড়া অন্য বিষয় হয় না, তাই এই পালায় যে বন্দনা গান গাওয়া হয় তাতে বিভিন্ন দেবদেবী এবং'রামায়ণের চরিত্রগুলির গুণকীর্তন করা হয়। ঐকতান বাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আসর। সকলে মিলে হরিধ্বনি দিয়ে বন্দনা শুরু করেন গীদাল। গীদাল ও দোয়ারী-এরা দুজনেই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। পালার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অন্য বিষয়ের অবতারণা করে থাকে দোয়ারী। এগুলির বেশিরভাগই রঙ্গ-তামাসামূলক। এগুলি 'ফ্যাসা' ও 'খোসা' নামে পরিচিত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রধান হল বেণা বা ব্যাণা। এই বাদ্যযন্ত্রটি সম্পর্কে সমালোচকেরা মনে করেন, "বেণা বা ব্যাণা শব্দটি বীনা থেকে উদ্ভূত।"[৮৫] তবে ব্যাণা ছাড়া বেহালা, খোল, করতাল, সারিন্দা, বাঁশি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি কুশান গানে ব্যবহৃত হয়। কুশীলবেরা সাধারণ পোশাকে অভিনয় করলেও ছোকরা চরিত্রেরা কিছুটা সাজসজ্জা করত। কিন্তু বর্তমানে কুশান লোকনাটকে প্রভূত পরিবর্তন দেখা যায়। গীদালের পরনে থাকে ধুতি-পাঞ্জাবী এবং গলায় থাকে উত্তরীয়। দোয়ারীর ঢিলেঢালা পোশাকের সাথে থাকে মাথায় টিকি, কপালে তিলক, হাতে বাঁকা লাঠি। গীদাল ও দোয়ারীর সাজসজ্জার ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যের আজও তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বহুকাল ধরে এই ঐতিহ্য চলে আসছে।

পূর্বে কুশান গান পয়ার ছন্দে গাওয়া হত। তবে এখন কিছু কিছু সংলাপ খাতায় লেখা হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে সঙ্গীতও রচিত হয়। আবার অনেক সময় আসরে উঠে তৎক্ষণাৎ সংলাপও রচনা করা হয়। সংলাপের ভাষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাই প্রাধান্য পায়। কুশান গানের ভাষা সম্পর্কে সুখবিলাস বর্মা বলেছেন, "উত্তরবঙ্গের ও তৎপার্শ্ববর্তী যে অঞ্চলে এই কুশান গান প্রচলিত সেই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাজবংশী নামে অভিহিত এবং তাদের ব্যবহৃত উপভাষা রাজবংশী বা কামরূপী বা কামতাপুরী উপভাষা কালক্রমে বাঙালী, বরেন্দ্রী ও রাঢ়ীর সঙ্গে মিশে এ মিশ্র-ভাষার জন্ম দিয়েছে।"[৮৬] কখনো কখনো তাই এই পালাগানে মিশ্র উপভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই পালা অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আগে কুশান গান চলত সারারাত ব্যাপী। কিন্তু এখন দর্শক ও শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী ৩-৪ ঘন্টা, আবার কোথাও ২ ঘন্টায়ও শেষ হতে দেখা

যায়। কুশান লোকনাটকের উল্লেখযোগ্য পালাগুলি হল— লবকুশ পালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দানবীর রাজা হরিশচন্দ্র, সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ প্রভৃতি।

বিষহরি ঃ পৌরাণিক লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিষহরা বা বিষহরি। এটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। জঙ্গলে পূর্ণ উত্তরবঙ্গের সর্পভীতি থেকেই মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে 'রিষহরা' পালা রচিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে বিবাহ বা কোন শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে দেবী মনসা বা বিষহরি পূজা করা হয়। পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনায় রাজবংশী গৃহস্থেরা প্রথা বা মানত অনুসারে বাড়ির উঠোনে বিষহরা পালাগানের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া শ্রাবণ মাসে মনসা পূজাকে কেন্দ্র করেও আসর বসে থাকে। পালাগানটি কতদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে, তা নির্ভর করে গৃহস্থের সামর্থ্যের উপর। কখনো তিন-সাতদিন পর্যন্ত পালাগানটি অনুষ্ঠিত হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু ঘটপূজা করে একদিনেই জাগানি ও ভাসানি করা হয়।

উন্মুক্ত স্থানে গোলাকার অংশে নৃত্য-গীত-অভিনয় হয়। চারদিক ঘিরে দর্শক ও শ্রোতারা বসে থাকেন। আবার কোথাও কোথাও চৌকি বসিয়ে অভিনয়স্থলকে কিছুটা উঁচু করা হয়। বিষহরির দলে থাকে মূল বা গীদাল, দোয়ারী, দোহার, ছুকরী ও বাজানদারসহ মোট ১০-১৫ জন সদস্য। গীদাল ও দোয়ারীর দক্ষতার উপরই এই পালাগানের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। গীদাল ও দোয়ারীর সাজসজ্জা কুশান পালার অনুরূপ হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে গীদালের হাতে থাকে একটি চামর। বিষহরার অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র হল মুখাবাঁশী। এছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যেমন– খোল, করতাল প্রভৃতি এই লোকনাটকের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বন্দনা গান দিয়েই বিষহরি পালার শুরু হয়। এই অংশে দেবী সরস্বতী ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনাও করা হয়ে থাকে। এছাড়া দিক্‌পতি ও গুরুর চরণ বন্দনা করা হয়। কুশান পালার মতোই গীদাল বন্দনা শেষে পালার নাম ঘোষণা করেন। বিষহরাতে মূলত প্রাধান্য পায় সতী বেহুলার জীবন ও সতীত্ব। গীদাল নিজেই কখনো সূত্রধর, কখনো চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করে। আবার দোয়ারী কখনো কখনো নেড়া ও বেহুলা উভয় চরিত্রে অংশগ্রহণ করে। বিষহরার ছুকরীদের নাচের ক্ষেত্রে বিশেষ একধরনের রীতি লক্ষ করা যায়। এই পালার অভিনয়ে কুশীলবেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সংলাপ, গীত ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। এই অভিনয় রীতি প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "যতক্ষণ ধরে অনুষ্ঠান চলতে থাকে, ততক্ষণের মধ্যে তাদের কেউ কখনো আসরে বসে না। ...তারা সবসময় একসঙ্গে আসরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যার যখন সময় সেই অনুযায়ী সংলাপ বলে, গান গায় ও নৃত্য করে।"[৮৭] আবার দোয়ারী রঙ্গ-তামাশামূলক গান বা কাহিনি পালার মাঝে মাঝে উপস্থাপন করে দর্শক ও শ্রোতাদের হাসায়-কাঁদায়। বর্তমানে এই পালার কিছু কিছু লিখিত রূপ থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংলাপ আসরেই সৃষ্টি হয়। তবে বিষহরি পালায় গদ্য সংলাপ খুবই কম। কারণ এক্ষেত্রে মনসামঙ্গলের পয়ার,

লাচারি ছন্দকে অনুসরণ করা হয়। এই পালায় মনসামঙ্গলের অনুসরণে চাঁদ সদাগরের মনসার ঘট ভাঙা, মনসার সপ্তডিঙা ডোবানো, লখিন্দরের প্রাণনাশ, বেহুলার স্বামীর সাথে কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়া, লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়া এবং শেষে চাঁদ সদাগরের মনসা পূজা ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়।

রাবান ঃ 'রাবান' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'রাবণ' শব্দের প্রভাবে। তবে এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক মনে করেন, "স্পষ্টই বোঝা যায় আবান বা রাবান হল রাবনবিষয়ক পালা। কিন্তু জলপাইগুড়ি-কোচবিহারেই শোনা যায়— রামায়ণ > আমায়ণ > আবায়ণ > রাবান (Rhotacism বা র-কারীভবন, 'রাবান' শব্দের সাদৃশ্য-সংযোগ ও তার প্রভাব); কিংবা, র-ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপের ফলে রামায়ণ > আমায়ণ > একেবারেই, 'রাবণ' শব্দের প্রভাবে রাবায়ণ > রাবান।"[৮৮] তাই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে 'র্'-এর 'অ' উচ্চারণ প্রবণতায় 'রাবান'-কে অনেকে 'আবান' উচ্চারণ করে থাকেন। রাবান লোকনাটকটি ভাদ্র ও আশ্বিনের জিতাষ্টমী উপলক্ষে অভিনীত হত। তবে এখন এটি বছরের যে কোনো সময় অভিনীত হয়। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার সমতলের বেশ কিছু অঞ্চলে রাবান লোকনাটকটি প্রচলিত।

১০-১৫ জন সদস্য নিয়ে রাবান গানের দল গড়ে ওঠে। গীদাল, দোহারকি, ছোকরা ও বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে এই পালা পরিবেশন করেন। রাবান গানের বাদ্যযন্ত্র বাঁশের করতাল। এই পালাগানের আসর বসে গৃহস্থের বাড়ির উন্মুক্ত উঠোনে কিংবা খোলা মাঠে। বৃত্তাকার আসরের চারিদিক ঘিরে দর্শকেরা বসেন। চট বা ত্রিপল দিয়ে আসরের উপর আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই পালাগানের কেন্দ্রিয় চরিত্র রাবণ। কুশান যেমন রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে রচিত হয়, তেমনি রাবান পালাগানে রাবণের উত্থান-পতনই মূল উপজীব্য। বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদনের পর বন্দনা শুরু হয়। কুশান পালার মতোই রাবানের বন্দনা গানে বিভিন্ন দেবদেবীর পাশাপাশি রামায়ণের চরিত্রগুলির মাহাত্ম্য স্তুতি করা হয়। বন্দনা শেষে গীদাল পালার নাম ঘোষণা করেন । এরপর গীদাল পালাগান গেয়ে যান এবং দোয়ারী তার 'ভাঙ্তি' দেয় অর্থাৎ গীদালের কথার ব্যাখ্যা দেন। এভাবে ক্রমপরম্পরায় গীদাল ও দোয়ারী পরস্পরের কথা ভাঙ্তির মাধ্যমে পালা এগিয়ে নিয়ে চলে। মাঝে মাঝে দোয়ারী ও অন্যান্য চরিত্রগুলি গানের ধুয়া তোলেন। এই ধুয়া অংশ এবং গানের অনুসরণে ছোকরারা নৃত্য করে। গীদাল, দোয়ারী ও ছোকরা— এরা প্রত্যেকেই একসাথে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন। তবে কুশান ও বিষহরার মতই রাবানেও খোসা ও ফ্যাসা গানের ব্যবহার রয়েছে।

রাবণ চরিত্রের বীরত্ব, দম্ভ, শোক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রাবান পালা গড়ে উঠলেও কোন কোন অঞ্চলে আর এক শ্রেণীর রাবান লক্ষ করা যায়। সেটি হল 'কেউটিয়া রাবান' বা 'কেউটিয়া আবন'। এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক আরেক জায়গায় বলেছেন, " 'কৈবর্ত' হইতে 'কেওট'+ ইয়া, এইভাবে 'কেউটিয়া' হইতে পারে। ....জিতুয়া ছাড়াও, অন্যান্য সময়েও 'কেউটিয়া আবন' গাওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয় 'কেউটিয়া আবন'

একান্তভাবেই জিতুয়ার আনুষ্ঠানিক গান নয়।"[৮৯] অর্থাৎ এ কথা আমরা ধরে নিতে পারি যে, রাবান থেকেই কেউটিয়া রাবানের উৎপত্তি। তাই দার্জিলিং জেলার সমতলের কিছু কিছু অঞ্চলে রাবান গানকে 'কেউটিয়া রাবান' বলা হয়ে থাকে। তবে রাবান রাবণকেন্দ্রিক গান হলেও 'কেউটিয়া আবনে'র ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে লোকায়ত জীবন মুখ্য হয়ে উঠেছে।

নটুয়া ঃ 'নটুয়া' শব্দটির অর্থ দিতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন, " 'নট' শব্দের সঙ্গে 'উয়া' প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় এর অর্থ দাঁড়ায় রঙ্গকারী।"[৯০] অর্থাৎ 'নট' বলতে সেসময় বহুরূপী, অঙ্গভঙ্গকারী, বাজিকর প্রমুখকে বোঝাত। আবার নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, " 'নটুয়া' শব্দটি চলিত বাঙলাতে চলিত না থাকিলেও, 'নটুয়া' কথাটি প্রচলিত আছে, যাহার অর্থ 'নট, নর্তক' ইত্যাদি। এই সব বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়,— রঙ্গ করিবার নাচকেই 'নটুয়া' বলে। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'নটুয়া' শব্দটির সহিত রঙ্গের ইঙ্গিত থাকিলেও, 'নটুয়া' গানে রঙ্গের ভাব খুব বেশি নাই।"[৯১] তবে শেষোক্ত কথাটির সাথে একমত হওয়া যায় না। কারণ নটুয়া রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান হলেও এর মধ্যে রঙ্গরস রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিশির মজুমদারের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি মনে করেছেন, "উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুরের দেশী-পলি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত 'নটুয়া'র প্রয়োগে নৃত্য, গীত ও অভিনয় আছে। এবং তা পুরোপুরি রঙ্গাত্মক।"[৯২] তবে নটুয়া কেবলমাত্র উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেই নয়, জলপাইগুড়ি ও সমতল দার্জিলিং জেলার সমতলের কিছু কিছু অঞ্চলে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া বিহারের সীমান্ত অঞ্চলেও নটুয়া প্রচলিত রয়েছে।

দশমীর পর থেকে কালীপূজা পর্যন্ত 'নটুয়া'-র আসর বসে। খোলা মাঠে কিংবা গৃহস্থের বাড়ির বাইরের উঠোনে নটুয়া অভিনীত হয়। এর আসর বৃত্তাকার। কমবয়সী মেয়েলী মুখাবয়বের ছেলেদের অর্থাৎ ছুকরীদের মধ্যে একজন রাধা সেজে থাকে। এক্ষেত্রে রাধা চরিত্রটিকে নাচে পারদর্শী হতে হয়। সংস্কৃত নাটকের বিদুষক চরিত্রের মত দু'জন 'বতেয়া' থাকে যারা উধব ও মাধব চরিত্রে অভিনয় করেন। উধব ও মাধব চরিত্রদুটি দর্শকদের কাছে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য অদ্ভুত সাজে সজ্জিত হন। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলির সাজসজ্জা অতি সাধারণ। গীদালের পরনে থাকে ধুতি পাঞ্জাবী এবং গলায় থাকে এক টুকরো কাপড়। রাধা ঘাগরা এবং উধব-মাধব লম্বা টুপি, ছেঁড়া শার্ট বা খাটো ধুতি পরেন।

অন্যান্য লোকনাটকের মতই বন্দনা দিয়ে নটুয়া পালাগান শুরু হয়। এই বন্দনাংশে কালী বন্দনা ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা করা হয়ে থাকে। নটুয়া মূলত দুটি অংশের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। (i) রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাহিনি, (ii) ফাকরি বা শ্লোক। এটি অনেকটা চোরচুন্নির মতই কথোপকথনমূলক। গীদাল পালাগানটিকে সংলাপ ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। এর মাঝে মাঝে উধব-মাধব চরিত্রদুটি গীদালের সাথে ফাকরি বা শ্লোকের মাধ্যমে রাধার দুঃখ বেদনার প্রসঙ্গ পাল্টে দেয়। রাধার হৃদয় বেদনার একঘেয়েমি থেকে দর্শক ও শ্রোতাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য এই শ্লোক বা ফাকরি ব্যবহার করে থাকেন পালাকারেরা।

লোকসমাজে এই ফাকরি বা ধাঁধাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। লোকশিক্ষার একটি অন্যতম প্রাচীন পদ্ধতি হল ফাকরি বা ধাঁধা। এতে শিক্ষনীয় বিষয়ের পাশাপাশি বুদ্ধি চর্চার বিষয়ও রয়েছে। এছাড়া এই ফাকরিগুলির মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের নানা দিক ফুটে ওঠে। তাই এই ফাকরিগুলি নটুয়ার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। তবে নটুয়া পালা কেবল মাত্র রাধা বিরহ ও ফাকরিতেই শেষ হয়ে যায় না ভাবের জগতে রাধা কৃষ্ণের মিলন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখানে রাধার নিজস্ব কোন সংলাপ নেই। কেবল নৃত্যের মাধ্যমে তার বিরহ-যাতনা প্রকাশ করে।

রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'নটুয়া' লোকনাটক। তবে পালাকারেরা এখানে কৃষ্ণের চাইতে রাধার অন্তর্বেদনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে নটুয়ার দুটি ধারা প্রচলিত রয়েছে– যথা, (ক) বিরোক বা বিরোথ পালা, (খ) কুঞ্জপালা। উভয় ধারাতেই রাধার প্রেম-বিরহ-মনোবেদনা বিষয়বস্তুরূপে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে বিরোক বা বিরহ পালায় রাধার অন্তর্বেদনা ও কৃষ্ণের জন্য হাহাকার প্রকাশ পায়। অন্যদিকে কুঞ্জপালায় রয়েছে রাধার প্রিয়তম কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা।

রাজধারী ঃ উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় লোকনাটক হল রাজধারী। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লক ও উত্তর দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে এর প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই লোকনাটক কোনক্রমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। তবে বিহার সীমান্তের কিছু এলাকায় এবং নেপালের ভদ্রপুর ও চন্দ্রগুড়ির রাজবংশী সমাজে এই লোকনাটকের প্রচলন রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজধারী লোকনাটক অনুষ্ঠিতহয় না। দুর্গাপূজার পর থেকে শীতকাল পর্যন্ত এটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। সাধারণত গ্রামে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বাড়লে কিংবা কোন মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে রাজধারীর আয়োজন করা হয়। কোন কোন সময় গৃহকর্তার আমন্ত্রণে গৃহস্থের বাড়ির বাইরের উঠোনে কিংবা উন্মুক্ত মাঠে রাজধারীর আসর বসে। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, ঢুলকি, কাড়া-নাকাড়া, বাঁশী, করতাল প্রভৃতি। বাদ্যযন্ত্রীসহ মোট ৬০-৭০ জন শিল্পী নিয়ে রাজধারীর দল গঠিত হয়। তবে এত লোক একসাথে পাওয়া সম্ভব নয় বলে ২৫-৩০ জন সদস্য নিয়ে কাজ চালাতে হয়। ফলে এক-একজনকে প্রায় ৮ টি চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য লোকনাটকের মতো প্রয়োজনানুসারে বাদ্যযন্ত্রীরাও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এখানে স্ত্রী চরিত্রেও পুরুষদেরই অভিনয় করতে দেখা যায়।

রাজধারী লোকনাটকের বিশেষ আকর্ষণ এর অভিনব মঞ্চসজ্জা ও মুখোশ। যেখানে রাজধারী অনুষ্ঠিত হবে সেখানকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী আসর নির্দিষ্ট করা হয়। এই আসর বর্গাকার কিংবা আয়তাকার দুই-ই হতে পারে। তবে আয়তাকার বা বর্গাকার যাই হোক না কেন, আসরের তিন দিক জুড়ে দর্শকেরা বসেন। আর যেদিকে দর্শক বসে না সেখানে এক কিনারে কিছু জায়গা নিয়ে বাঁশ দিয়ে মাঁচার মতো তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে

মাঁচাটি বেশি উঁচু হবে না। সেই মাঁচা থেকে ওঠা-নামা করার জন্য বাঁশের সিঁড়িও তৈরি করা হয়। এই মাঁচাটিকে রাবণের সিংহাসনের প্রতীক বলে ধরা হয়। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'লঙ্কা বান্ধা'। আর এক কোণে বাঁশ দিয়ে ঘরের মতো আচ্ছাদন দিয়ে 'অশোক বন' নির্মাণ করা হয়। তাই কোন কোন অঞ্চলে রাজধারীর অপর নাম 'লঙ্কার গান'। অন্যদিকে শিল্পীদের বড় বড় কাঠের মুখোশের ব্যবহার রাজধারী লোকনাটকটিতে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। রাবণ ও তার বংশের প্রতিটি চরিত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট মুখোশ রয়েছে। এদের মধ্যে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের মুখোশ আয়তনে সবচেয়ে বড়। এছাড়া হনুমান, জাম্বুবান, বানর, বাঘ, দেবী দুর্গা প্রভৃতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও মুখোশ ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র দুটি আসরে মুখোশ ব্যবহার করে না। পোশাকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই লোকনাটকের রাজবৃত্তাধিকারী চরিত্রেরা রাজপোশাকে আসরে নামে। আর এই পোশাকগুলি জোগাড় করা যথেষ্ট ব্যায়সাধ্য। এই পোশাকগুলি তৈরি করা হয় মোটা কাপড়ের ওপর রঙিন কাপড় দিয়ে। তার ওপর থাকে জরি ও ঝিল্লির কাজ। কিন্তু রাম-লক্ষণ আসরে নামে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে অতি সাধারণ মেক-আপ নিয়ে। এছাড়া প্রতিটি চরিত্রই কমবেশি মেক-আপ নিয়ে থাকেন।

পালার মূল গায়ক রাম লক্ষণের বন্দনা দিয়ে বন্দনা গান শুরু করেন। এর সাথে রামের অনুগামীদেরও বন্দনা করা হয়। এছাড়া কালী এবং চৈতন্য মহাপ্রভুরও স্তুতি গাওয়া হয়ে থাকে এই অংশে। বন্দনা পর্বের শেষে শুরু হয় 'ডাক'। ঘটনা পারম্পর্য অনুসরণ করে এই ডাকগুলি দেওয়া হয়। এরপর হয় পালাগানের সূচনা। তবে অরণ্যকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডের কাহিনিই বেশি প্রাধান্য পায় রাজধারীতে। এর মধ্যে যেসব ঘটনা অতি নাটকীয়, যেমন– সুর্পনখার নাসিকা ছেদন, সীতাহরণ, বালিবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসা, সেতুবন্ধন, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি অংশগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাকি অংশ মূল গায়ক সূত্রধরের মতো বর্ণনা করে যান। কারণ সময়াভাবে পুরো কাহিনি প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে রাম-সীতার প্রসঙ্গ এখানে তেমন গুরুত্ব পায় না। রাবণ ও তার রাক্ষস বংশের জাত্যাভিমান এখানে প্রধান। মাঝে মধ্যে দু'জন বতেয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে দর্শকদের হাস্যরসের জোগান দেন। রাজধারীর অভিনয়ের অভিনবত্ব লক্ষ করার মতো। বিশেষ করে রাম-রাবণের যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রদর্শনের জন্য দোহারেরা মশাল জ্বালে, আবার কেউ কেউ মুখে কেরোসিন দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয় আগুনের বৃত্ত। সঙ্গে সঙ্গে বাজতে থাকে ঢোল, খোল, কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সেই মুহূর্তে আসরেও যেন যুদ্ধের বিভীষিকা ফুটিয়ে তোলা হয়। দোহারদের চিৎকার, উদ্দাম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে সূচিত হয় রাবণের পরাজয়। শেষে লঙ্কার প্রতীকি মঞ্চে আগুন ধরিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশে জয়সূচক মঙ্গলধ্বনি দেওয়া হয় শঙ্খের মাধ্যমে।

কাল্পনিক বা রূপকথা আশ্রিত বিষয় নির্ভয় ঃ

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি অন্তর্লীন যোগ রয়েছে। তাই লোকসাহিত্যের অনেক উপাদানই লোকনাটকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কিছু লোকনাটক আছে, যার মধ্যে লোককথা বা

রূপকথা কাহিনির বিষয় হয়ে ওঠে। বিষয় যেহেতু লোককথা ও রূপকথাধর্মী, স্বভাবতই সেখানে অলৌকিকতা প্রাধান্য পায়। পালাকারেরা রূপকথা বা লোককথাকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক চরিত্র প্রতিস্থাপন করে পালার রূপ দান করে। এই ধরনের লোকনাটকগুলিতে প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজা-বাদশার কাহিনিই স্থান পায়। লোককথা ও রূপকথা ছাড়াও বিভিন্ন গাথা-গীতিকা যেমন-পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালা এতে অভিনীত হয়। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক রোমান্স যাই হোক না কেন, এতে শেষপর্যন্ত প্রেমের জয় ঘোষিত হয় এবং এই পালাগুলির মধ্য দিয়ে নীতিকথা উঠে আসে, যা সাধারণ লোকসমাজকে জীবনে চলার পথে রসদ জোগাতে সাহায্য করে। আবার কখনও কখনও দর্শক ও শ্রোতা পালার চরিত্রগুলির সাথে একাত্ম হয়ে কল্পনার সমুদ্রে পাড়ি দেয়।

দোতরা ঃ বঙ্গদেশ দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম শাসনের অধীনে থাকার ফলে সঙ্গত কারণেই শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অন্যান্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ মুসলিম শাসকেরা রাজ্য শাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় ধ্বজার নিচে আনতে চেয়েছিলেন অন্যান্য সম্প্রদায়কে। তুর্কী আক্রমণ, ঔরঙ্গজেবের প্রবল হিন্দু বিদ্বেষ, কালাপাহাড়ের দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস প্রভৃতি ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারত হইতে মুসলমান ফকিরগণ বাঙলাদেশে আসিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যপুষ্ট এই সকল মুসলমান সাধু ফকিরদিগের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তাহাদের যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভাবের উদয় হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। শ্রদ্ধাভাবটি এখানে গৌণ, যে ভাবটি মুখ্যত উদয় হইয়াছিল, তাহা ভয়, ...।"[৯৩] তবে শ্রদ্ধা কিংবা ভয় যাই হোক না কেন এর ফলে বাদশা, আমির, ফকির, পীর-পয়গম্বর প্রমুখের গুণকীর্তন করে গ্রামীণ কবিরা পদ রচনা করতেন। আর এই ধরনের পদগুলি গ্রামীণ কবিরা পালাকারে পরিবেশন করতেন দোতরা নামক বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে। কালক্রমে এগুলিই দোতরা পালা নামে পরিচিত হয়।

দোতরা গানের উদ্ভব ও প্রচলন সম্পর্কে পরবর্তীকালে আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "ফার্সী ভাষার 'দোতার' শব্দটি যে উত্তর বাংলায় 'দোতারা' রূপে ব্যবহার করা হয়, তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের দোতারা ও পারস্যদেশের দোতারার গঠনভঙ্গিতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। ...দোতার এবং দোতারা শব্দদুটিও অভিন্ন।

....গৌড়ে মুসলিম রাজধানী স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য দেশীয় বহু শিল্পী, শ্রমিক কর্মী তারাও এদেশে এসে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিবেশীদের প্রভাবিত করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তখনই উত্তরবাংলার দোতারার গানের উদ্ভব এবং বিকাশ হয়।"[৯৪] অর্থাৎ তিনি মনে করেন

উত্তরবঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতির ফলশ্রুতি হল দোতরা। দোতরা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করে যে লোকনাট্যের বিকাশ তা দোতরা পালা নামে পরিচিত। এটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সমাজের অন্যতম একটি জনপ্রিয় লোকনাটক। বর্ষাকাল ছাড়া যে কোন সময় দোতরা পালার আসর বসে। দেব-দেবীর থানে, গৃহস্থের উঠোনে বা উন্মুক্ত মাঠে এই লোকনাটক অভিনয় হয়। কোথাও কোথাও মাটি দিয়ে অভিনয় স্থলটিকে কিছুটা উঁচু করে নেওয়া হয়। আসরের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রী এবং অন্যান্য শিল্পীরা বৃত্তাকারে বসেন। তাদেরকে চারদিকে ঘিরে থাকেন দর্শক ও শ্রোতারা। দোতারা ছাড়া বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে খোল, করতাল, বাঁশি, জুড়ি, সারিন্দা। কুশান গানের সঙ্গে দোতরা পালাগানের শিল্পী, আসর, উপস্থাপনরীতি, ভাষা, সাজসজ্জা প্রভৃতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কুশান, বিষহরা প্রভৃতি লোকনাটকের মতই বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে আসর শুরু হয়। এরপর পরিবেশিত হয় বন্দনা গান। বন্দনা গানে দেবী সরস্বতীর পাশাপাশি অন্যান্য দেবী-দেবতারাও স্থান পায়। বন্দনা শেষে গীদাল ও দোয়ারী সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে পালার কাহিনি ব্যাখ্যা করে যান। চরিত্রানুযায়ী শিল্পীরা আসর থেকে উঠে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। মাঝে মাঝে চলে ছুকরীদের নৃত্য। পালা চলাকালীন দর্শকদের মানসিক বিরতি দানের জন্য দোয়ারী ফাস বা খোসা গান উপস্থাপন করে থাকেন। লোককথা, ঐতিহাসিক - রোমান্টিক উপাখ্যান, রূপকথা, কাল্পনিক কাহিনি প্রভৃতি দোতরা লোকনাটকের বিষয়বস্তু। দোতরা পালা পূর্বে মুখে মুখে রচিত ও পরিবেশিত হত। সারারাত ধরে চলা এই দোতরা পালা এখন সময়ের অভাবে ও দর্শকের রুচি অনুযায়ী দুই-তিন ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়। দোতরা পালার মধ্যে বিখ্যাত পালাগুলি হল– বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী, মরুচমতি, দুবুলাবালী, মধুমালা-মদনকুমার, গুঞ্জরাবিবি ও সাত সতীন, করিম বাদশা প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র

১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, পৃ. ১৮২।

২. ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, পৃ. ২৬১।

৩. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ১৮২।

৪. নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, নবম ভাগ, পৃ. ৭১৩।

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১২৯।

৬. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১।

৭. লোকশ্রুতি - সংকলন সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫০।

৮. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃ. ১।

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পৃ. ৫৪১।

১০. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৫০১।

১১. ধ্রুব দাস, ভারতের লোকনাট্য, পৃ. ১৪ - ১৫।

১২. The New Encyclopaedia Britanica, Vol - 7, Page- 457.

১৩. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ২৫।

১৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৫০১।

১৫. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ৪৬৫।

১৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ৫।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ৪৮৪।

১৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ১৭।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৩৭১।

২২. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

২৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭৫।

২৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ২০।

২৫. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ, পৃ. ২১১।

২৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ২৯।

২৭. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৬৭।

২৮. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 137.

২৯. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির দেবদেবী ও পূজাপার্বণ, পৃ. ১৫১।

৩০. নির্মলেন্দু ভৌমিক, মেছেনি লোকনাট্যের সম্ভাবনা, লোকশ্রুতি, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৯৬-৯৭।

৩১. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ১৭৫।

৩২. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পৃ. ২৮৫।

৩৩. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ১৭৫।

৩৪. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৮৮।

৩৫. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 144.

৩৬. W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal, Vol-X, Page - 378.

৩৭. Sir James Jarj Frazer, The Golden Bough, Vol-I, Page - 248.

৩৮. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৯১।

৩৯. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 144.

৪০. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৪১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৩৪৬।

৪২. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 138.

৪৩. সুখবিলাস বর্মা, জাগ গান, পৃ. ২৬।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৪৫. মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত, লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ২৬৪।

৪৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ২৭৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৪৮. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৫।

৪৯. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ২৮১।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

৫১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩১।

৫২. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ২৭৯।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৫৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ১৬৯।

৫৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, পৃ. ২৪৪।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৫৮. নির্মলেন্দু ভৌমিক, জলপাইগুড়ির লোকসংগীতের রূপরেখা, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পৃ. ৩১৭-৩১৮।

৫৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।

৬০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১২৯।

৬১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, জনযোগাযোগ ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটক, নকশিকাঁথা, পৃ. ৩৩।

৬২. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৯৫।

৬৩. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৭৮।

৬৪. শ্রী সুকুমার সেন সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত, চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ, পৃ. ১১১।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯।

৬৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩১।

৬৭. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ৩-৪।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৬৯. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার, পৃ. ৭।

৭০. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৬৪-৬৫।

৭১. শ্রীফণীগোপাল পাল, উত্তর বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, পৃ.১৫৭।

৭২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩২।

৭৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৩৭।

৭৪. হরিপদ চক্রবর্তী, মালদহের গম্ভীরা ও আলকাপ, মধুপর্ণী, মালদহ জেলা সংখ্যা, পৃ. ৭৭।

৭৫. সুবোধ চৌধুরী, ডোমনি, পৃ. ৭০।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৮০. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ২।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৮২. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৪।

৮৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩৬।

৮৪. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৯১।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৮৬. সুখবিলাস বর্মা, কুশান গান, স্মারক পুস্তিকা, আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি, পৃ. অনুল্লিখিত।

৮৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩৮।

৮৮. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, Vol-6 No. 1, পৃ. ১৮ - ১৯।

৮৯. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ১০৩।

৯০. সুকুমার সেন, নট-নাট্য-নাটক, পৃ. ১২।

৯১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৩৭৯।

৯২. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৬৬।

৯৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩১।

৯৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, দোতারার জন্মরহস্য, স্মরণিকা, লোকসংস্কৃতি উৎসব, পৃ. ১-২।